মূর্ছনা

সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক সংখ্যা

শচীন দেববর্মন স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়
লিচুবাগান, আগরতলা

মূর্ছনা-২০১৪

সঙ্গীত শিল্প সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা
তৃতীয় সংখ্যা ঃ সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক সংখ্যা

SDBM Govt. Music College, September-2014

Murchana - 2014

Golden Jubilee Special Issue
A House Magazine on Music, Art & Culture

Published by the Principal on behalf of Sachin Debbarman Memorial Govt. Music college, Lichubagan, Agartala
Pin. 799006, Tripura

Editors
Sri Mrinal Roy
Smt Kalpana Dey

Financial Assistance :
Directorate of Higher Education
Govt. of Tripura, Agartala
&
UGC, NERO, Guwahati

Cover design by : Susanta Sankar Hazra
Printed by : Colours, Agartala, Tel 2318967

Tapan Chakraborti

MINISTER
Education, I & C, IT and Law
Government of Tripura.
Phone : 0381-241 3276 (O)
FAX : 0381-241 3263
0381- 232 4044 (R)

MESSAGE

It gives me immense pleasure to learn that Sachin Deb Barman Memorial Government Music College, Lichubagan, Agartala is going to bring out the College Magazine “MURCHANA” on the eve of Golden Jubilee Celebration.

It is indeed a matter of great pleasure that the Magazine which will be published in connection with this occasion will enlighten the history of Sachin Deb Barman’s glorious contribution on music and to promote the classical music and show the new dimension of music.

I wish the efforts of the Sachin Deb Barman Memorial Government Music College, Lichubagan, Agartala a grand success.

(Tapan Chakraborti)

VICE-CHAIRMAN
Tripura State Planning Board
Government of Tripura
and
PRESIDENT
Tripura Tapasili Jati Samannaya Samity
PATRON
Matri Bhasa Mission, Ambedkar Mission,
Mohana Centre of Culture & Heritage,
Ganga-Gomati-Barak-Brahmaputra Maitree Sangha,
Bharatia Dalit Sahitya Akedemy

Anil Sarkar

MESSAGE

It gives me immense pleasure to learn that the Sachin Deb Barman Memorial Government Music College, Agartala is going to publish a Magazine named “MURCHANA” as special episode to mark of its Golden Jubilee Celebration.

I wish all success of the said publication and hope that it would become a collectors’ item containing rich and well thought articles and beautiful illustrations.

I extend my warm felicitation to all concerned for publication of the Magazine.

(Anil Sarkar)

K. Ambuly

SECRETARY
GOVERNMENT OF TRIPURA
TRANSPORT & HIGHER
EDUCATION DEPARTMENTS

MESSAGE

I am very happy to know that Sachin Deb Barman Memorial Government Music College, Agartala is going to publish a special edition of the college Magazine “MURCHANA” on the occasion of golden jubilee celebration of the college. I appreciate this initiative taken by the college and hope that the magazine will highlight the transition of the college from a school of music set up by private initiative to a full fledged music college.

I wish the golden jubilee celebration a grand success.

(K. Ambuly)

DR. BIPRADAS PALIT

DIRECTOR
HIGHER EDUCATION
DEPARTMENT
GOVERNMENT OF TRIPURA

MESSAGE

I am very happy to know that during the 50th years Golden Jubilee Celebration of Sachin Debbarman Memorial Government Music College in this year a speacial issue titled “Murchana” would be published by them.

I am also very happy to know that this magazine is being brought out to commemorate this occasion.

I hope the articles published in the magazine will throw enormous light on the history of the college and provide information on its present activities.

I wish the 50th years Golden Jubilee Celebration of the college along with publication of the Magazine a grand success.

(Dr. Bipradas Palit)

শ্রদ্ধায় স্মরণ
সঙ্গীতাচার্য পুলিন ঠাকুর

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শিল্পী ও সাধক পুলিন দেববর্মা ১৯১৪ সালের ১০ই মার্চ আগরতলার কৃষ্ণনগরের ঠাকুর পল্লী রোডের টি.আর.টি.সি. সংলগ্ন বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুরের পূজারী, সঙ্গীতের প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ এবং কণ্ঠে ছিল ঈশ্বর প্রদত্ত সুর।

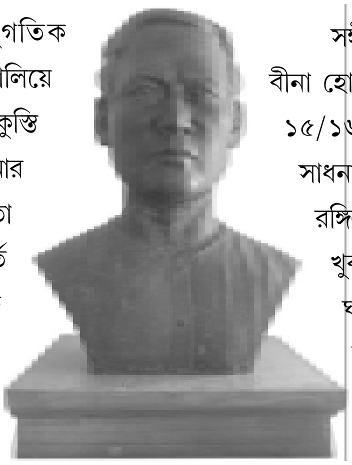

ছোটবেলা থেকেই গতানুগতিক পড়াশুনায় তাঁর মন বসত না। স্কুল পালিয়ে গান গয়ে বেড়াতেন বা আখড়ায় গিয়ে কুস্তি করতে পছন্দ করতেন। ছেলের পড়াশুনোর প্রতি অমনযোগ লক্ষ্য করে তাঁর পিতা তাঁকে উমাকান্ত স্কুলের বোর্ডিং-এ ভর্তি করে দেন। কিন্তু তিনি ছিলেন মুক্ত বিহঙ্গ, খোলা আকাশের নীচে স্বাধীনভাবে গান গেয়ে বেড়ানোই ছিল তাঁর একমাত্র নেশা ও আনন্দ। ১৩৪০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে ত্রিপুরার সঙ্গীতপ্রিয় মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর বালক পুলিনের গানের প্রশংসা শুনে তাঁকে তাঁর রাজসভায় ডেকে পাঠান ও গান গাইতে বলেন এবং তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীত শুনে অভিভূত হন। তারপরই তিনি পুলিন ঠাকুরের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষার জন্য ২৫ টাকা মাসিক বৃত্তির বন্দোবস্ত করে দেন। সেই সঙ্গীত বৃত্তির টাকায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম নেওয়ার জন্য তিনি লক্ষ্ণৌ-এর মরিস কলেজে গিয়ে ভর্তি হন। মরিস কলেজে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শিক্ষক ছিলেন ওস্তাদ রতন ঝংকার এবং আগা খাঁ। ওস্তাদ আগা খাঁ রঙ্গিলা ঘরানার প্রবর্তক ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর কাকা ছিলেন। সেই সময়ে লক্ষ্ণৌতে পুলিন ঠাকুরের সতীর্থরা ছিলেন—চিন্ময় লাহিড়ী, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পি.এন. চিনচোরে প্রমুখ। লক্ষ্ণৌতে বিশারদ ডিগ্রী লাভ করার পর ওস্তাদ বরকত আলি খাঁর নিকট আরও তিন বছর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম নেন। ওস্তাদ বরকত আলি খাঁ ছিলেন বিখ্যাত ওস্তাদ গোলাম আলি খাঁর ভাই।

সঙ্গীত তাঁর কাছে সাধনার বস্তু ছিল। লক্ষ্ণৌর বীনা হোস্টেলে থাকাকালীন সময়ে তিনি রোজ ১৫/১৬ ঘন্টা রেওয়াজ করতেন। এই কঠোর সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন অর্থাৎ রঙ্গিলা ঘরানার গায়ন শৈলী ও তানকর্তব তিনি খুবই ভালভাবে রপ্ত করেছিলেন। রঙ্গিলা ঘরানার বিশিষ্ট গায়ন শৈলী দানাদার তান যা কিনা খুবই তালিমী রেওয়াজ ছাড়া আয়ত্ব করা যায় না তা তাঁর কণ্ঠে অনায়াসলভ্য ছিল।

লক্ষ্ণৌ থেকে সঙ্গীতের শিক্ষা পর্ব সাঙ্গ করে তিনি কলকাতায় আসেন ত্রিশের দশকের শেষ দিকে। কলকাতায় তিনি ত্রিপুরার মহারাজার মর্ডান ব্যাংকে যোগ দেন। সেই সময়ে তিনি কলকাতা ও ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত প্রোগ্রাম করতেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে তাঁর নাম ও যশ কলকাতার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং ছাত্রছাত্রীর ভিড়ও ক্রমশ বাড়তে থাকে। কিন্তু মাটির টানে, জন্মভূমির টানে কলকাতা থেকে তিনি আগরতলায় চলে আসেন। একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে জন্মভূমির প্রতি দায়বদ্ধতাই তাঁকে ত্রিপুরায় টেনে এনেছে।

ত্রিপুরার রাজদরবারে যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, নৃত্য ও বাদ্যের চর্চা হত তা রাজ দরবারেই সীমাবদ্ধ ছিল। তখনকার সময়ের

সাধারণ মানুষেরা সঙ্গীতের সেই রসমাধুর্য থেকে বঞ্চিত ছিল। পুলিন ঠাকুরই সর্বপ্রথম সর্ব সাধারণের মধ্যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রচারের জন্য নিজের বাড়িতে 'বীরবিক্রম সঙ্গীত বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। ১৯৫১ সালে সেই বিদ্যালয় কলেজ অব মিউজিক এন্ড ফাইন আর্টস' নামে উমাকান্ত একাডেমীর পশ্চিমদিকের লাল দালান ও টিনের ঘরে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৫৭ সালে কলেজটি 'ভাতখন্ড সঙ্গীত বিদ্যাপীঠের' অনুমোদন পায় এবং ১৯৬৪ সালে 'সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়' নামে ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত হয়। পুলিন ঠাকুর এই কলেজে অধ্যাপনার কাজ করতেন এবং শেষের দিকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবেও কিছুদিন কাজ করেছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আপনভোলা ও উদাসীন প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং যথেষ্ট সুরুচি সম্পন্ন ছিলেন। ঝকঝকে পাম্প -সু ও ইস্ত্রি করা ধুতি পাঞ্জাবী পরে চলাফেরা করতে ভালবাসতেন। জীবনে দারিদ্র্যের কশাঘাত অনেক সহ্য করেছেন কিন্তু সঙ্গীত সাধনা থেকে সরে আসেননি। তিনি তাঁর ওস্তাদের কাছ থেকে পাওয়া তালিমের বাইরে যেতেন না। লক্ষ্ণৌতে থাকাকালীন সময়ে একটানা সাতবছর তিনি রাতে ইমন রাগ ও ভোরবেলা ভৈরবী রাগের সাধনা করে গেছেন। আসরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশনের মুহূর্ত আগেও তিনি বলতে পারতেন না যে কী রাগ গাইবেন। তানপুরা মিলিয়ে আসরে বসার পর দু-চোখ বুঁজে ধ্যানস্থ হতেন এবং তখনই রাগ নির্ণয় করে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। তাঁর গায়ন কৌশল ছিল অনন্য এবং গেয় সঙ্গীতের সুরেলা মাধুর্য ছড়িয়ে তিনি গোটা রাজ্যের সঙ্গীতপ্রিয় মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন।

পুলিন দেববর্মাকে এককথায় ত্রিপুরার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসারের পুরোধা বলা যায়। তিনি নিজে অর্থলাভ, যশলাভ ও খ্যাতির মোহ ছেড়ে সঙ্গীতকে সর্বজনের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। দূরদর্শনের ও বেতারের অনুষ্ঠানের সুপ্রতিষ্ঠিত এই মহান শিল্পীর সুযোগ্য ছাত্রছাত্রীরা ছিলেন—নৃপেন্দ্র চন্দ্র দে, ধীরেন্দ্র বণিক, রাজ্যেশ্বর বণিক, শিবেন্দ্র চক্রবর্তী, সত্যেন দাশ, বারীন দেববর্মা, রবি নাগ, আরতি কর, নারায়ণ দেববর্মা ও তারক রায় প্রমুখ।

ত্রিপুরার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে পুলিন দেববর্মার অবদানকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করার জন্য ত্রিপুরা সরকারের উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় 'পুলিন দেববর্মা স্মৃতি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সমারোহ' নামে ২০০৪ সাল থেকে প্রতি বছর একটি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করে আসছে। পুলিন দেববর্মা চাইতেন সাধারণ মানুষের মধ্যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা উত্তরোত্তর বেড়ে উঠুক। বলা যায় তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বন্ধ দরজা আমজনতার নিকট খুলে দিতে চেয়েছিলেন, তিনি জানতেন এই ধরনের সঙ্গীত সাধনা মানুষের জীবনের আধ্যাত্মিক দিককে যেমন উন্নত করতে পারে, পারে মানুষের অন্তরের পাশবিকতাকে নাশ করে সুকোমল বৃত্তিগুলোকে জাগাতে। তাঁর উৎসর্গীকৃত সাংগীতিক জীবন থেকে প্রেরণা নিয়ে নতুন প্রজন্ম শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে সাদরে গ্রহণ করুক এবং তাদের অন্তরের কোমল বৃত্তিগুলোর সুপ্রকাশ ঘটুক তবেই তাঁর প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

শ্রদ্ধায় স্মরণ
সুরসম্রাট শচীন দেববর্মন

বাংলার আবহমান সুর যিনি ভারতের সঙ্গীতাকাশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি ত্রিপুরার সুযোগ্য সন্তান মহারাজ কুমার শচীন দেববর্মন। ত্রিপুরার রাজপরিবারে ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর কুমিল্লায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নবদ্বীপ মহারাজ কুমার এবং মা মণিপুর রাজপরিবারের কন্যা নিরুপমা দেবী। পাঁচ ভাই চার বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট শচীন দেববর্মন। অভিজাত রাজ পরিবারের প্রাচুর্য্যের মধ্যে লালিত হলেও জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গেই মাটির টান অনুভব করে মাটির কোলে থাকতেই ভালবাসতেন। তাঁর খুব আপন লাগতো সহজ সরল মাটির মানুষকে।

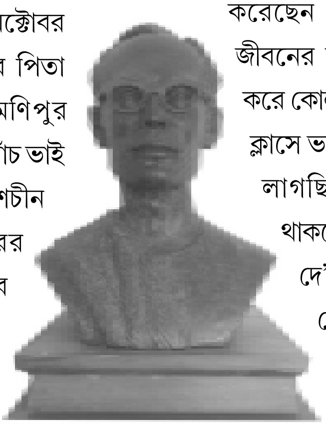

কুমিল্লা শহরেই তাঁর ছোটবেলা কেটেছিল প্রথমে কিছুদিন ইউসুফ স্কুলে পড়েছিলেন, পরে ক্লাস ফাইভে উঠে কুমিল্লা জেলা স্কুলে ভর্তি হন। স্কুলের সরস্বতী পূজার অনুষ্ঠানে বাবার শেখানো গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। নবদ্বীপ কর্তা চেয়েছিলেন ধ্রুপদ ও খেয়াল গায়ক শ্যামাচরণ দত্তের কাছে পুত্র গান শিখুক কিন্তু পুত্র রাজি হলেন না, পিতার কাছেই গান শেখা চলতে লাগলো। দূর থেকে ভাটিয়ালি সুর কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে তাঁর পড়াশুনা ওলট-পালট করে দিত। যাই হোক ১৯২০ সালে ১৪বৎসর বয়সে তিনি ম্যাট্রিক পাস করে ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হন-তবে কলেজের ক্লাস ফাঁকি দিয়ে গ্রামে গ্রামে ভাটিয়ালি ও বাউল গায়কদের সাথে ঘুরে বেড়াতেন।

১৯২৩ সালে ভিক্টোরিয়া কলেজেই বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হন, সঙ্গে চলে গ্রামে গ্রামে বাংলা গানের অনুসন্ধান। চাষী-জেলেদের সঙ্গে, বাউল বৈষ্ণব ভাটিয়ালি গায়ক ও গাজন দলের সঙ্গে ছুটির ফাঁকে, কলেজ ফাঁকি দিয়ে সময় কাটাতেন গান গেয়ে। এই অঞ্চলের সব গ্রাম নদী তিনি চষে বেড়িয়েছেন আর সংগ্রহ করেছেন গান। এই সময়কার সংগ্রহ তার সারা জীবনের সম্পদ। ১৯২৪ সালে তিনি বি.এ.পাশ করে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হলেন কিন্তু তাঁর পড়াশুনা আর ভাল লাগছিল না, মন চাইছিল গানে ডুবে থাকতে-গান শিখতে। ১৯২৫ সালে কৃষ্ণচন্দ্র দে'র কাছে সঙ্গীত শিক্ষা শুরু করলেন, তিনিই কোলকাতায় তাঁর প্রথম সঙ্গীত গুরু। এরপর পড়া ছেড়ে দিলেন। পিতা চাইলেন ছেলে আইন নিয়ে পড়াশুনা করুক, কিন্তু শচীন কর্তা নারাজ, ফলে পড়াশুনা বন্ধ করে ডুবে গেলে সঙ্গীত সাধনায়।

কৃষ্ণচন্দ্রের অনুমতি নিয়ে তাঁর গুরু ওস্তাদ বাদল খাঁর কাছে শিখলেন তবে ১৯৩৭ সালে বাদল খাঁর মৃত্যু হওয়ায় শচীন কর্তা তাঁকে বেশিদিন পান নি। কিছুদিন হারমোনিয়াম ও ঠুম্‌রি বিশেষজ্ঞ শ্যামলাল ছেত্রীর কাছেও শিখেছেন। বেনারসী ঠুম্‌রি আর ঠুম্‌রির বোল বানাবার উপায় শিখেছিলেন। কোলকাতা থেকে বছরে কম করেও তিনবার কুমিল্লা ও আগরতলায় আসেন। ফকির বৈষ্ণবদের ডেকে এনে গান শুনতেন ও ভালো লাগলে কথা লিখে নিতেন, সুর তুলে নিতেন। সায়েব আলি নামে একজন ঘরামি লোকগানের ভান্ডারি ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে গান লিখে নিয়ে তিনি পরে রেকর্ডও করেছেন। ১৯৩০ সালে তাঁর পিতার মৃত্যু হলে তিনি নিঃসহায় হয়ে যান। দাদারা পরামর্শ দেন রাজবাড়িতে ফিরে গিয়ে নিশ্চিন্ত ভোগ সুখের জীবন যাপন করতে কিন্তু যিনি গানের ভুবনে পা দিয়েছেন তাঁর

পক্ষে রাজবাড়িতে ফিরে নিশ্চিত জীবন যাপন করা সম্ভব নয় তাই আর ফেরা হল না। শুরু হল জীবন সংগ্রাম। বাড়ির সাহায্য ছাড়াই তিনি সঙ্গীত সাধনা বজায় রাখলেন টিউশনি করে, একখানা ভাড়া ঘরে থেকে। চললো রেওয়াজ, বড় বড় ওস্তাদের সঙ্গ আর গান বাজনা। খ্যাতিমান সঙ্গীতজ্ঞ ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও তিনি সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

শচীন কর্তা যেমন দিনের পর দিন লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করেছেন, তেমনি বছরের পর বছর রাগ সঙ্গীতেও সেরা শিল্পীদের অধীনে তালিম নিয়েছেন ফলে লোকগীতি আর ধ্রুপদী গানের সার্থক যুগলবন্দি ঘটেছিল তাঁর গানে। কবি নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর খুবই বন্ধুত্ব ছিল। তাঁর অনেক গান শচীন কর্তা রেকর্ড করেছেন। ১৯৩২ সালের পর হিন্দুস্থান কোম্পানীতে শচীন কর্তার একটার পর একটা গান রেকর্ড হয়েছে। ১৯৩৪ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে অল ইন্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সে তিনি আমন্ত্রিত হন এবং ঠুম্‌রি ও বাংলা গান গেয়ে সকল শ্রোতার হৃদয়-মন জয় করেন। এখানেই ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ওস্তাদজি তাঁর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছিলেন। পর পর তিনবার তিনি এখানে ডাক পেরেছিলেন। ১৯৩৫ সালে কোলকাতা মিউজিক কন্‌ফারেন্সে ওস্তাদ ফৈয়জ খাঁ সাহেবের সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি পরিচয় হয়। তাঁর সামনেই তিনি ঠুম্‌রি পরিবেশন করেছেন। ধীরে ধীরে শচীন কর্তার জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে, রেডিওতে নিয়মিত গান গাইতে থাকেন, ছাত্র-ছাত্রীদের গান শিখিয়ে টাকা উপার্জন হতে থাকে। স্থাপন করেন সঙ্গীত শিক্ষার স্কুল—"সুর মন্দির"।

১৯৩৮ সালে ঢাকার জজ রায় বাহাদুর শ্রী কমলনাথ দাশগুপ্তের নাতনি মীরা দাশগুপ্তার সঙ্গে শচীন কর্তা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। মীরা দেবী তাঁর ছাত্রী ছিলেন। তিনিও ছিলেন অত্যন্ত গুণী। নৃত্য, রবীন্দ্রসঙ্গীত, কীর্তন, ঠুম্‌রি, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ইত্যাদি সবকিছুর তালিম নিয়েছিলেন। তিনি রেডিও শিল্পী ছিলেন। তাঁর বাংলা ও হিন্দী গানের রেকর্ডও প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া তিনি গীতিকার এবং সুরকার ছিলেন। তাঁরা ছিলেন আদর্শ-দম্পতি। মীরা দেবী কেবল সহধর্মিনীই নন শচীন কর্তার সঙ্গীত জীবনের সাফল্যের পিছনে তাঁর সহযোগিতা, প্রেরণা, উৎসাহ ও আত্মত্যাগ ছিল। ১৯৩৯ সালে তাঁদের একমাত্র সন্তান রাহুল জন্মগ্রহণ করে।

১৯৪৪ সালে শচীন দেববর্মন পাকাপাকিভাবে মুম্বাই চলে যান। সেখানে সিনেমার সঙ্গীত পরিচালক হয়ে চালান সুরের পরীক্ষা নিরীক্ষা। একটার পর একটা ছবির গান হিট্ হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে কালজয়ী সঙ্গীত। মুম্বাইয়ের চলচ্চিত্র জগতে তিন দশক ধরে তিনি রাজত্ব করেছেন। তাঁর সুরের জাদুতে মাতিয়ে রেখেছেন ত্রিপুরা, বাঙলা, মহারাষ্ট্র তথা পুরো ভারতবর্ষ। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী।

জীবনে দু'হাতে যেমন পয়সা উপার্জন করেছেন তেমনি অনেক পুরস্কারও লাভ করেছেন। ১৯৫৩ সালে 'ট্যাক্সি ড্রাইভার' সিনেমার সুরকার হিসেবে 'ফিল্ম ফেয়ার' পুরস্কার পান। ১৯৫৮ সালে 'সঙ্গীত নাটক একাডেমি' পুরস্কার পান। ১৯৫৯ সালে 'পিয়াসা' ছবিতে সুরারোপের জন্য 'এশিয়ান ফিল্ম সোসাইটি' পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬২ সালে হেলসিঙ্কি, ফিনল্যান্ড আন্তর্জাতিক সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় ছিলেন অন্যতম বিচারক।

১৯৬৩ সালে 'ত্রিপুরা ললিত কলা কেন্দ্র' কোলকাতায় শচীন কর্তাকে মানপত্র দান করেন।

১৯৬৪ সালে 'ক্যায়সে কঁহু' ছবিতে সুরারোপের জন্য 'সুর শৃঙ্গার সংসদ' তাঁকে 'সন্ত হরিদাস' পুরস্কার প্রদান করে। ১৯৬৯ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে সম্মানিত করেন। ১৯৭৪ সালে 'অভিমান' সিনেমায় সুরারোপের জন্য আবার 'ফিল্ম ফেয়ার' পুরস্কার পান।

১৯৭৫ সালের ৩১ শে অক্টোবর তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে। এখনো আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়ায় তাঁর "তোরা কে যাস্‌রে ভাটি গাঙ্ বাইয়া","আমি তাকডুম্ তাকডুম্ বাজাই"ইত্যাদি গানের সুর। তিনি বকুল বিছানো পথে যেতে যেতে ছড়িয়ে দিয়েছেন গানের ইন্দ্রধনু। সঙ্গীতের কিংবদন্তি পুরুষ, ত্রিপরার সুযোগ্য পুত্র শচীন দেববর্মন আজো সঙ্গীত প্রিয় মানুষের হৃদয়ে জীবন্ত, চিরদিনই বেঁচে থাকবেন সুরের রাজাধিরাজ হয়ে।

অধ্যক্ষার কলমে...

অনাদিকাল থেকে মানুষের জীবনে সঙ্গীতের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সঙ্গীত সুখে-দুঃখে আনন্দে-বিষাদে পৃথিবীর সকল শ্রেণির সকল জাতির মানুষের আবেগময় আশ্রয় যা জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সে কারণেই মনে হয় আনন্দ উল্লাসের সময় যেমন আদিম মানুষেরা শরীরে বিভঙ্গ তুলে নাচত তেমনি তাদের কণ্ঠে জেগে উঠত সুরের বৈচিত্র্য। আমরা জানি বৈদিক যুগে সঙ্গীতের দ্বারা দেবতাদের আরাধনা করা হত, গাওয়া হত সামগান যাকে ভারতীয় সঙ্গীতের জননী বলা হয়। সামগানের পরবর্তী স্তরগুলোতে একে একে গান্ধর্বসঙ্গীত বা মার্গসঙ্গীত, দেশী সঙ্গীত, প্রবন্ধসঙ্গীত এবং সবশেষে হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এর উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ ঘটে। এই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির একটি প্রধানতম স্তম্ভ বলা যায়।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরার অরণ্যময় পাহাড়ী জীবনেও সঙ্গীতের সুদূরপ্রসারী প্রভাব আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। পাহাড়ের কোলে জুমের ফসল কাটতে গিয়ে এখানকার যুবক-যুবতীরা আনন্দে নাচ-গান করে, এখানকার উপজাতি জনজীবনের সামাজিক ও ধর্মীয় নানা উৎসবকে কেন্দ্র করে রয়েছে গড়িয়া, লেবাং, মামিতা, হজাগিরি প্রভৃতি নানাধরনের নৃত্য-গীত। এগুলোর কোনটি ফসল কাটার উৎসবকে ঘিরে আবার কোনটি কর্মসঙ্গীত রূপে স্বীকৃত। পূর্ণিমা রাতে পাহাড়ের টং ঘর থেকে জাদুকলিজার ও চমপ্রেং এর সুরের সঙ্গে খাম বা মাদলের আওয়াজ যে মোহময় সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে তা এখানকার খেটেখাওয়া পরিশ্রমী মানুষদের জীবনকে স্বর্গসুধায় ভরে তোলে, তারা তাদের সারাদিনের ক্লান্তি ভুলে যায়। রাজবাড়ির ছেলে শচীনকর্তা তাঁর গ্রন্থে লিখেছিলেন : 'ত্রিপুরা সম্বন্ধে এই প্রবাদ আছে যে, সেখানকার রাজা, রানী, কুমার, কুমারী থেকে দাসদাসী পর্যন্ত সবাই গান গায়। গলায় সুর নেই গাইতে পারে না এমন কেউ নাকি এখানে জন্মায় না। ত্রিপুরার ধানের ক্ষেতে চাষীরা গান গাইতে গাইতে চাষ করে, নদীর জলে মাঝিরা গানের টান না দিয়ে নৌকা চালাতে জানে না, জেলেরা গান গেয়ে মাছ ধরে, তাঁতিরা তাঁত বুনতে বুনতে আর মজুরেরা পরিশ্রম করতে করতে গান গায়। সেখানকার লোকেদের গানের গলা ভগবান প্রদত্ত। আমি সেই ত্রিপুরার মাটির মানুষ— তাই বোধ হয় আমার জীবনটাও শুধু গান গেয়ে কেটে গেল।' (শতবর্ষে শচীন দেববর্মন' শ্যামল চক্রবর্তী)

শচীনকর্তার তাঁর নিজের রাজ্য সম্পর্কে এই মন্তব্য কোনো অত্যুক্তি নয়। আসলেই সঙ্গীত, কাব্য, চিত্র ও ভাস্কর্যের মত নান্দনিক কলাচর্চার ক্ষেত্রে ভারতের প্রান্তিক জনপদ এই ত্রিপুরা যে সুপ্রাচীন কাল থেকেই যে বিশেষ গৌরবের অধিকারী তা ভাবলে আশ্চর্যান্বিত হতে হয়। এখানকার রাজন্যবর্গ শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হওয়ার পাশাপাশি নিজেরাও ছিলেন একেকজন উঁচুদরের শিল্পী ও সমজদার। ফলে দেশ-বিদেশের রসগ্রাহী কলাবন্ত ব্যক্তিত্ববর্গের কাছে এই রাজ্য বারবার প্রশংসিত হয়েছে। বহু খ্যাতিমান ও প্রতিভাধর শিল্পীদেরকে ত্রিপুরার রাজারা এখানে আনিয়েছিলেন যাদের গানবাজনায় রাজদরবার মুখরিত হত। রাজমালা থেকে এ জাতীয় বহু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। রাজা ধন্যমানিক্য প্রজাশিক্ষা ও প্রজারঞ্জনের জন্য সুদূর ত্রিহূত দেশ অর্থাৎ মিথিলা থেকে সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পী আনিয়েছিলেন। সেতার ও এসরাজ বাদনে যেমন পারঙ্গম ছিলেন মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্য তেমনি ছিলেন বীরবিক্রম কিশোর। আর আমরা সকলেই জানি যে মহারাজ বীরচন্দ্রও ছিলেন সুগায়ক এবং নানাবিধ যন্ত্রবাদনে সুপটু। বীরচন্দ্র মাণিক্য কর্তৃক যদুভট্টের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'তানরাজ' উপাধিতে ভূষিত করা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রথম কবিস্বীকৃতি প্রদান এবং রাজ আগ্রহে তাঁর পরপর সাতবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই ত্রিপুরায় আসা— এসব ঘটনাই ত্রিপুরার সংস্কৃতির ইতিহাসকে গৌরবোজ্জ্বল করেছে। সেই সময়ে মহারাজ বীরচন্দ্রের লেখা অতি উচ্চমানের ছয়টি কাব্যগ্রন্থ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও আশ্চর্যান্বিত করেছিল। বলা হয় সেই সময়ে নবাব ওয়াজেদ আলির দরবারের পরই বীরচন্দ্র মাণিক্যের দরবার ছিল নবরত্নের মিলনভূমি। এসব ঐতিহাসিক স্বর্ণযুগের ইতিহাস আমাদের ত্রিপুরাবাসী হিসেবে যে অতিশয় গর্বিত করে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

মহাবিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত 'মূর্ছনা'র এই বিশেষ সংখ্যায় ত্রিপুরার রাজন্য আমলের সঙ্গীতচর্চা ও নৃত্যচর্চা সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য সঙ্গীতশিল্পী সুদীপ্তশেখর মিশ্র, মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষা ড. পদ্মিনী চক্রবর্তী প্রমুখ কয়েকজনের লেখায় প্রসঙ্গক্রমে এসেছে। বলা বাহুল্য রাজদরবারের সংস্কৃতিচর্চার ঢেউ সেই সময়েই এসে লাগে রাজধানীর প্রজাসাধারণের মনেও। সেই অনুপ্রেরণাতেই ঘরে ঘরে সঙ্গীতচর্চার প্রতি উত্তরোত্তর আগ্রহ বাড়তে থাকে। অনিলকৃষ্ণ দেববর্মা ও সুরেশকৃষ্ণ দেববর্মার সঙ্গে বাবা আলাউদ্দীন খাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল। তিনিও একাধিকবার ত্রিপুরায় আসেন এবং উজীরবাড়িকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষদের মধ্যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রসার ঘটতে থাকে। উজীর বাড়ির 'অনিল সঙ্গীত বিদ্যালয়'কে থেকে রাজ্যে বহু শিল্পী

উঠে আসেন। বালক পুলিন দেববর্মাও এখান থেকেই তাঁর সঙ্গীতের প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। পুলিন দেববর্মাকে বৃত্তি দিয়ে লক্ষ্ণৌ এর মরিস কলেজে সঙ্গীতের উচ্চতর তালিম নিতে পাঠান সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ত্রিপুরার মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর। শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার পর পরবর্তী সময়ে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত শিক্ষার স্রোতস্বিনীকে আমজনতার ধরাছোঁয়ার মধ্যে নিয়ে আসার কাজ করেছেন ত্রিপুরার ভগীরথ পুলিন দেববর্মা। তাঁকে নিয়ে কিছু লেখা স্থান পেয়েছে এই পুস্তিকাতে। কিভাবে পুলিন দেববর্মার স্থাপিত 'কলেজ অব মিউজিক এন্ড ফাইন আর্টস্' (১৯৫১) সরকার কর্তৃক ১৯৬৪ সালে অধিগৃহীত হয়ে সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় রূপে পরিগণিত হল সে ইতিহাস আজ আমাদের সকলেরই জানা। পুলিন দেববর্মা যদি রাজ অনুগ্রহ লাভ করে রাজ দরবারের গায়ক হয়ে যেতেন বা কলকাতাতেই থেকে গিয়ে সেখানেই একজন বড় শিল্পী রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যেতেন তাহলে ত্রিপুরার সঙ্গীত শিক্ষার চিত্রটি কিরূপ হত এই প্রশ্ন যে কোন সঙ্গীত চিন্তকের মনের মধ্যে ভিড় করতেই পারে। প্রায় শুরুর সময় থেকে সেই সময়ের সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের টুকরো টুকরো স্মৃতি নিয়ে স্মৃতিমাল্য রচনা করেছেন এই মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রী ত্রিপুরেন্দ্র ভৌমিক।

যাই হোক পুলিন দেববর্মার গড়ে তোলা এই সঙ্গীতশিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বিগত পঞ্চাশ বছর যাবত সরকারের পরিচালনায় রাজ্যের সঙ্গীত পিপাসু শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা দেওয়ার ভূমিকা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছে। আরো আশার কথা এই যে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসারে পুলিন দেববর্মা যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা আজও অব্যাহত আছে। সরকারীভাবে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সহায়তায় ২০০৪ সাল থেকে প্রতি বছর পালিত হচ্ছে 'পুলিন দেববর্মা স্মৃতি নিখিল ত্রিপুরা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সমারোহ'। এই সঙ্গীত সমারোহে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরার প্রতিটি মহকুমার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। এই বছর সঙ্গীতাচার্য পুলিন দেববর্মার শতবর্ষ পূর্তির বছর। এই বছরেই আগামী কিছুদিনের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হবে পুলিন দেববর্মার নামাঙ্কিত প্রেক্ষাগৃহ 'পুলিন দেববর্মা অডিটরিয়াম' টি যেটি লিচুবাগানস্থিত মিউজিক কলেজ ও আর্টস্ কলেজ ক্যাম্পাসে এখন নির্মাণের শেষ পর্বে আছে। ২০০৯ সালে মিউজিক কলেজটিরও নতুন স্থানে (লিচুবাগান) নতুন আঙ্গিকে নতুন নামকরণ হয়। ত্রিপুরার মাঝিমাল্লা, জেলে-কৃষক প্রভৃতি জনমানুষের মেঠো সুরের গানকে যিনি বিশ্বের দরবারে শুধু পৌঁছেই দেন নি এগুলোকে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তার অমর আসনে প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে গেছেন সেই সুরস্রষ্টা ত্রিপুরার রাজকুমার শচীন দেববর্মনের নামে বর্তমানে মহাবিদ্যালয়টির নাম শচীন দেববর্মন স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়। মহাবিদ্যালয়ের অতীত ও ভবিষ্যৎ পুলিন দেববর্মা ও কুমার শচীন দেববর্মন এই দুই মহান সঙ্গীত সাধকের নামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়ানো। দুজনের আদর্শ, সঙ্গীতের প্রতি নিষ্ঠা ও আগ্রহ এবং তাদের মহান জীবন মহাবিদ্যালয়ের আগামী প্রজন্মের বিদ্যার্থীদের চলার পথের পাথেয়। বর্তমানে মহাবিদ্যালয়টিতে ভাতখন্ড কোর্সটি চালু না থাকলেও এখানে সঙ্গীতের বিভিন্ন শাখায় ত্রিবর্ষীয় বি. মিউজ অনার্স এবং মিউজিক এ ডিপ্লোমা কোর্স এর পঠনপাঠন হয়। আশার কথা এই যে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রতি বছরেই উত্তরোত্তর বাড়ছে। সঙ্গীতকে ভালবেসে একে জীবনের লক্ষ্য এবং পেশা হিসেবে নিতে চাইছে কোমলমতি সঙ্গীতবিদ্যার্থীরা। তবে এক্ষেত্রে হয়ত তাদেরকে কিছুটা নিরাশ হতে হচ্ছে। তার কারণ সঙ্গীতস্নাতকদের চাকুরিহীনতা। হাতে গোনা প্রথিতযশা শিল্পীদেরকে বাদ দিলে অন্যান্য শিল্পীদেরকে তাদের প্রাপ্য মর্যাদা সেরকমভাবে দিতে পারছি কী আমরা? একজন শিল্পীকে তার সাধিত পরিবেশিত শিল্পের মাধ্যমে সামাজিক জীবনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও নান্দনিক ঐতিহ্য রক্ষার পাশাপাশি ব্যক্তিজীবনের রুটিরুজির সমস্যার কথাও ভাবতে হয়। সঙ্গীত বিদ্যার্থীরা যদি অদূর ভবিষ্যতে তাদের উপযুক্ত পেশা নির্বাচনের সুযোগ পায় যাতে করে তারা তাদের দৈনন্দিন সমস্যার উর্ধ্বে ওঠে আরোও বেশি করে সঙ্গীত-সরস্বতীর আরাধনা করতে পারে তাহলে ভাল হয়। ভাল হয়, যদি এই মহাবিদ্যালয়েই স্নাতকোত্তর স্তরে সঙ্গীতের সব বিভাগে তাদের পড়ার সুযোগ ঘটে।

বর্তমান কালে 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং' যেমন একটা ভয়ানক সংকট গোটা পৃথিবীর, ঠিক তেমনি ভয়াবহ চিন্তার কারণ হচ্ছে বিশ্বায়নের সুদূরপ্রসারী প্রভাব। প্রতিনিয়ত যুব সম্প্রদায়ের কাছে আসছে নানাবিধ প্রলোভন ও ভোগবাদী সংস্কৃতির হাতছানি। ফলে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও তার ঐতিহ্য এখন লোপ পেতে চলেছে। যুব সম্প্রদায়ের কিছু অংশ বিভ্রান্ত ও কিছু অংশ দিশাহীন হয়ে পড়ছে দিন কে দিন। সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ হয়ত তাদেরকে বিপথগামিতা থেকে রক্ষা করতে পারবে তারা হয়ে উঠবেন সুসংস্কৃত দায়িত্ববান নাগরিক। সুচেতনার শিল্পবোধ তাদেরকে রুচিশীল করবে, তারা সুস্থ জীবনবোধে উদ্দীপ্ত হবেন এবং নিজস্ব সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করবেন, এই লক্ষ্যে শচীন দেববর্মন সমৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় নিরন্তর সচেতন ভূমিকা পালন করে চলেছে। পরিশেষে 'মূর্ছনা'র এই বিশেষ সংখ্যা রূপায়ণে যারা ব্রতী হয়েছেন ও পত্রিকাটিকে সুস্পষ্ট রূপ দিতে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন এবং যে সমস্ত লেখকগণ তাদের মূল্যবান লেখা দিয়ে 'মূর্ছনা'কে সমৃদ্ধ করেছেন সকলের প্রতি রইল অশেষ কৃতজ্ঞতা। সবশেষে 'মূর্ছনা'র উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও প্রবহমানতা কামনা করি।

মণিকা দাস
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা
শচীন দেববর্মন স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়

সম্পাদকীয়

কথা আগে না সুর আগে তা নিয়ে যেমন মতভেদ আছে তেমনি সুরের সৃষ্টি নিয়েও মতভেদ রয়েছে। বাতাসের শন্ শন্ শব্দ, পাখির কলকাকলি এবং ঝরনার জলের কলতানে নাকি ছন্দের সৃষ্টি । একজন জার্মান দার্শনিক বলেছিলেন 'In the Begining there was Rytham'। বই যেমন মনের খোরাক মেটায় তেমনি সঙ্গীত মনের আনন্দ মেটায়। সুরের ঐকতানে বোধ ও মননের মেলবন্ধন ঘটাতেই শচীন দেববর্মন স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের মুখপত্র 'মূর্ছনা'র আত্মপ্রকাশ। বর্ষায় নিকানো আকাশে ভাসতে শুরু করেছে শরতের টুকরো মেঘ, কাশবন ক্রমশঃ সাদা হচ্ছে, ভিজে বাতাসে আসছে শিউলি ফুলের সু-গন্ধ, আগমনির বাঁশিতে শোনা যাচ্ছে শ্রেষ্ঠ উৎসবের পদধ্বনি । এই শুভ আনন্দ মুহূর্তেই হবে আমাদের 'মূর্ছনা'র তৃতীয় সংখ্যার উদ্বোধন।

পায়ে পায়ে চলতে চলতে আমাদের মহাবিদ্যালয় পঞ্চাশ বছর পূর্ণ করেছে। এই সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালনের অঙ্গ হিসেবে 'মূর্ছনা'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। এই সংখ্যাকে গুণী লেখক-গবেষকরা লেখা দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। 'মূর্ছনা'র সকল লেখকদের জানাই সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ। যেসব বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আমাদের আর্থিক সহায়তা করেছেন এবং এই স্মরণিকা প্রকাশে যাঁরা আন্তরিক সাহায্য করেছেন-বিশেষ করে প্রকাশক, উপদেষ্টা মণ্ডলী প্রমুখ সকলকে জানাই অজস্র ধন্যবাদ ও পাঠকদের জানাই শুভেচ্ছা।

'মূর্ছনা'র সুস্থ রুচিশীল সংস্কৃতি ও মননশীল সাহিত্য সৃজন ব্রতে সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য। সকলের সম্মিলিত সুরে 'মূর্ছনা' ভরে উঠুক। পরিশেষে রবীন্দ্র-বাণীতে প্রার্থনা করি—

মন হোক ক্ষুদ্রতা মুক্ত নিখিলের সাথে হোক যুক্ত
শুভ কর্মে যেন নাহি মানে ক্লান্তি।

ধন্যবাদ সহ
কল্পনা দে
মৃনাল রায়

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

ত্রিপুরায় মণিপুরী নৃত্যচর্চা
ড. পদ্মিনী চক্রবর্তী # ১৫

নাটকে সঙ্গীত ঃ ভাস ও কালিদাস
রামেশ্বর ভট্টাচার্য # ১৭

সঙ্গীত শিল্পী প্রতিভা বসু
মণিকা দাস # ১৯

রবীন্দ্র কাব্যে নারী
ড. গীতা দেবনাথ # ২৭

রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল আত্মঘাতী অপচয়ের অসম ইতিহাস
অরুণ কুমার বসু # ২৯

ভারতীয় সংগীতের উৎকর্ষ সন্ধানে
ডঃ স্নিগ্ধতনু বন্দ্যোপাধ্যায় # ৩৪

ভারতীয় বৃন্দবাদনের ইতিহাস ও ক্রমবিবর্তনের ধারা
সিদ্ধার্থ চৌধুরী # ৩৮

"শাহেনশা-ই-গজল" ওস্তাদ মেহেদি হাসান খান —একটি শ্রদ্ধার্ঘ্য
কল্পনা দে # ৪০

সংস্কৃতির আঙ্গিনায় ত্রিপুরা
ড. দেবব্রত দেবরায় # ৪৩

ত্রিপুরায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা
সুদীপ্ত শেখর মিশ্র # ৪৬

মঞ্চাভিনয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে অভিনেতার দায়িত্ব
পার্থ মজুমদার # ৪৮

ভারতের জাতীয় সঙ্গীত ঃ প্রেক্ষাপট ও সঙ্কট
অলকানন্দা চৌধুরী # ৫০

যেখানে কথা ও সুরের সহযোগে ভাবের প্রকাশ— সেখানেই সঙ্গীতের উৎকর্ষ
সুতপা চৌধুরী # ৫২

ঐতিহ্যবাহী শচীন দেববর্মন মেমোরিয়াল সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয় প্রসঙ্গে
জহর সূত্রধর # ৫৩

নৃত্যের কিছু কথা
অলকা দে # ৫৪

The Musical Genius of Pt. Kumar Gandharva: An Introspective Study
Ms. Tripti Watwe # ৫৫

Hindustani music and Rabindra sangeet
SHOUNAK RAY # ৫৭

Impact of YOGA on Dance
Smita Lahkar # ৫৮

Role of Media in Performing Arts
Sarita Banik # ৬০

Classical Instrument of India SANTOOR
Suman Ghosh # ৬১

স্মৃতি কথা

কিছু স্মৃতি কিছু কথা
ত্রিপুরেন্দ্র ভৌমিক # ৬২

স্মৃতি-বিস্মৃতির আলোকে সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়
ড. উমাশঙ্কর চক্রবর্তী # ৬৭

কবিতা

স্বাধীনতা-২০১৪
অনিল সরকার # ৬৯

'তবলা'
শ্যামল দেব # ৭০

পাওনা
নীলাদ্রি দেবনাথ # ৭০

শ্রদ্ধা ও স্মরণ

আমার স্বপনচারিণী সুচিত্রা সেন
সংহিতা ঘোষ # ৭১

তবলা বাদক প্রশান্ত দেববর্মা স্মরণে
মৃনাল রায় # ৭৩

অনুলিখন

পুরনো সেই দিনের কথা 'নেই নিষ্ঠা নেই অনুশীলন'
৭৪

প্রবন্ধ

ত্রিপুরায় মণিপুরী নৃত্যচর্চা

■ ড. পদ্মিনী চক্রবর্তী

ভারতবর্ষের যে কটি শাস্ত্রীয় নৃত্য আছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মণিপুর রাজ্যের মণিপুরী নৃত্যকলা। এই নৃত্যকলা তার অনন্য সৌন্দর্য নিয়ে বিশ্বের দরবারে স্থান করে নিয়েছে। মণিপুরী নৃত্যকলা ভারতের প্রায় অনেক স্থানেই কম বেশী চর্চিত হয়। সাত বোনের ছোট বোন সুন্দরী ত্রিপুরাতেও মণিপুরী নৃত্য বহুল স্থান অধিকার করে আছে।

আমরা জানি যখনই কোন নৃত্যকলার প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি পায়, তার পেছনে থাকে রাজানুকুল্য এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গুণীজনদের অবদান। বিদ্যোৎসাহী, সংস্কৃতিবান এবং গুণীজনদের পৃষ্ঠপোষকতায় নিরন্তর সচেষ্ট হিসেবে ত্রিপুরার মহারাজাদের সুনাম সর্বজনবিদিত। মণিপুরী নৃত্যের প্রথম চর্চা শুরু হয় ত্রিপুরার রাজঅন্দর মহলে।

ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের ইতিহাস 'রাজমালা' গ্রন্থ অনুসারে ১৭৫তম নৃপতি রাজধর মাণিক্য। তিনি ১৭৯৮সালে মণিপুররাজ পামহৈবার পুত্র ভাগ্যচন্দ্র জয়সিংহের কন্যা শ্রীমতী হরিসেশ্বরীকে বিবাহ করেন। পামহৈবার সময়েই মণিপুরে বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তৃতি লাভ করে। ফলতঃ ত্রিপুরার রাজঅন্তঃপুরে মণিপুর দুহিতার সঙ্গে আসা অভিজাতমণিপুরী স্ত্রী-পুরুষের সহযোগে গড়ে ওঠে মণিপুরী নৃত্যধারার পরিমন্ডল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রাজধর মাণিক্যের পৌত্র কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য মণিপুর রাজ মারজিৎ সিংহের তিনকন্যা চন্দ্রকলা, অখিলেশ্বরী ও বিধুবালাকে বিবাহ করেন। এই সময়েই ব্যাপকভাবে সব স্তরের মণিপুরী সম্প্রদায়ের ত্রিপুরায় আগমন ঘটে এবং প্রাসাদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাসাদের বাইরেও গড়ে ওঠে মণিপুরী নৃত্যচর্চার পরিমন্ডল। কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের পুত্র ঈশানচন্দ্র মাণিক্য ১৮৫০সালে সিংহাসনে আরোহনের পর শ্রীহট্ট থেকে আগত বিখ্যাত খোলবাদক বাবু মৈরাংখেম-বাবুনির ভগ্নী জাতীশ্বরীকে বিবাহ করেন। যার গর্ভজাত সন্তান নবদ্বীপচন্দ্র বাহাদুর যিনি সংগীতজ্ঞ কুমার শচীন দেববর্মনের পিতা। ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের অনুজ রাজর্ষি বীরচন্দ্র মাণিক্য বিবাহ করেন মণিপুর রাজদুহিতা ভানুমতী দেবীকে। বৈবাহিক সূত্রেই ত্রিপুরার রাজঅন্দরে মণিপুরী নৃত্যকলার চর্চা শুরু হয়।

রাজঅন্তঃপুরে কিভাবে মণিপুরী নৃত্যের চর্চা ও প্রসারতা লাভ করে এই প্রসঙ্গে মহারাজ কুমার স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মন (লালুকর্তা) এর কন্যা শ্রীমতী মলিনা দেবী এবং মহারাজকুমারী কমলপ্রভা দেবী তাঁদের স্মৃতিচারণে বলেন যে, মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময় থেকেই মণিপুরী নৃত্যের প্রচলন শুরু হয়। এই সময় থেকেই অন্দরমহলের মহিলারা নৃত্য-গীতে অংশ নেওয়া শুরু করেন। নাচের মধ্যে প্রধানতঃ মণিপুরী মহারাস, বসন্তরাস, কুঞ্জরাস, ঝুলন নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া রাসযাত্রা উপলক্ষ্যে 'খুপাইসৈ' নামক নৃত্য অনুষ্ঠিত হত (খুপা-করতাল, ইসৈ-করতালি সহযোগে গান অর্থাৎ করতাল দিয়ে গান করে বৃত্তাকার ঘুরে ঘুরে মেয়েরাই নৃত্য করত)। রাজপরিবারের ৩০/৪০ জন মেয়ে বসন্তরাসের নৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দিত। শ্রাবণ পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত মহারাস নৃত্য সারারাত্রি ধরে চলত, মহারাজকুমার স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মণের কন্যা শ্রীমতী মলিনা দেবী এবং তার বোনেরাও এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। শ্রদ্ধেয়া মলিনা দেবীর মাতা অর্থাৎ স্বর্গীয়া ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মণের স্ত্রী নিজেও একজন মণিপুরী নৃত্য শিল্পী ছিলেন। তাঁর নৃত্য শিক্ষক ছিলেন বাবু চৌবা সিং। পরবর্তী সময়ে তিনিই মলিনা দেবী ও অন্যান্য অন্তঃপুর বাসিনীদের নৃত্য শিক্ষা দেন। এছাড়াও নৃত্যগুরু হিসেবে ছিলেন কুমুদঠাকুর ও নবকুমার সিংহ প্রমুখ। মৃদঙ্গ বা পুংবাদকদের মধ্যে ছিলেন গোকুলচাঁদ সিংহ ও ধুন্ধু কবিরাজ।

রাজঅন্তঃপুরে মণিপুরী নৃত্যানুষ্ঠানগুলো পরিচালনা করতেন অমিয়া দেবী (রাধাকিশোর মাণিক্যের কন্যা) ও ইন্দিরা দেবী (রাধাকিশোর মাণিক্যের পৌত্রী)। আর এক গুণীজনের কথা এখানে উল্লেখ না করলে অন্দরমহলে যে মণিপুরী নৃত্যের প্রসারতা বৃদ্ধি পেয়েছিলো তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তিনি হলেন মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরের কন্যা ও মহারাজকুমার রমেন্দ্রকিশোর দেববর্মনের পত্নী মহারাজ কুমারী কমলপ্রভাদেবী। তিনি রাজঅন্তঃপুরে মণিপুরী নৃত্য ও গীতাদিকে উৎকর্ষের শিখরে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঝুলন এবং হোলী উৎসব উপলক্ষে রাজঅন্দর মহলের অন্যান্য মহিলাদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা বিষয়ক ছোট ছোট কাহিনী নিয়ে মণিপুরী নৃত্যের আঙ্গিকে পরিবেশন করতেন। আরও একটি মণিপুরী নৃত্যের তখন প্রচলন ছিল। নৃত্যটি হচ্ছে মন্দিরা নৃত্য। ২০/২৫ জন শিল্পী মন্দিরা সহযোগে নৃত্য করতেন। অবিবাহিতা মণিপুরী যুবতীকে বলা হত লৈশাবী (লৈ-ফুল, শাবী-যুবতী)। এই মন্দিরা নৃত্য এখনও প্রচলিত। মন্দিরা নৃত্য দেখে এখনো মনে হয় মণিপুরী 'মাইবি জগোই' নৃত্যর একটি পরিবর্ত্তিত রূপ। ('মাইবি'—পুজারিনী, জগোই—নৃত্য। শুভ আত্মাকে আবাহন করে যে নৃত্য মণিপুরীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী রাজাদের কাছে মন্দিরা নৃত্যে পর্যবসিত হয় বলে অনুমান।

ত্রিপুরার রাজঅন্তঃপুর থেকে এই মণিপুরী নৃত্যকলাকে যে গুরুরা ত্রিপুরার জনসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে

মণিপুরী নৃত্যকলা সম্পর্কে আগ্রহ এবং মণিপুরী নৃত্য শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন তারা হলেন স্বর্গীয় বুদ্ধিমন্ত সিংহ, স্বর্গীয় কুমুদঠাকুর, স্বর্গীয় নবকুমার সিংহ, স্বর্গীয় বসন্ত সিংহ প্রমুখগণ। বিশেষ করে ত্রিপুরার রাজপরিবারে এবং রাজধানী আগরতলায় মণিপুরী নৃত্যের, উৎকর্ষসাধন এবং শান্তিনিকেতনে নৃত্য-নাট্যের প্রধান রূপকার হিসেবে স্বর্গীয় নবকুমার সিংহের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

নবকুমার সিংহ, বসন্তসিংহের পর মণিপুরী নাচের গতিশীল ধারাটি যাঁরা ধরে রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয়— রাজকুমার সুরেন্দ্রজিৎ সিংহ এবং রাজকুমার চন্দ্রজিৎ সিংহ।

পরবর্তী সময়ে মণিপুরী নৃত্যকলা রাজধানী আগরতলায় অবস্থিত 'ত্রিপুরা সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয়ের' অ্যাকাডেমিক চর্চার অন্তর্ভুক্ত হয়। রাজকুমার সুরেন্দ্রজিৎ সিংহ দীর্ঘদিন ত্রিপুরা সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে এবং রাজকুমার চন্দ্রজিৎ সিংহ মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে মণিপুরী নৃত্যকলা শিক্ষা দিয়ে প্রচুর ছাত্রছাত্রী তৈরী করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে থেকে গুরু অঙ্গনথৈমী সিং ত্রিপুরা সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয়ে মণিপুরী নৃত্যশিক্ষা দিয়েছিলেন। এছাড়া সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয়ের গুরু স্বর্গীয় বিহারী সিংও মণিপুরী নৃত্যকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ব্যক্তি প্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠানগত প্রচেষ্টায় প্রথমেই নাম করতে হয়, রমেশ দত্ত, স্বর্গীয় কুঞ্জেশ্বর দত্ত প্রমূখ এবং আগরতলার বাইরে, যেমন—খোয়াই, কৈলাশহর ইত্যাদি মহকুমায় গুরু বীর সিং, মণি সিংহ প্রমুখ গুরুদের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বর্তমানে ত্রিপরার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর মণিপুরী গুরুরা ছড়িয়ে আছেন এবং নৃত্য শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন।

ত্রিপুরায় রাজঅন্তঃপুরের মণিপুরী নৃত্যচর্চা মণিপুরী নৃত্যধারা থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র রূপ পেয়েছে। মণিপুরী রাস নৃত্যে অঙ্গচালনা খুব কম হলেও ত্রিপুরায় মোটামুটিভাবে অঙ্গচালনা করেই নৃত্য করা হয়। মণিপুরে মণিপুরী নাচ যতটা সংযতভঙ্গীতে এবং কমনীয়ভাবে করা হয়, ত্রিপুরার মণিপুরী নৃত্যে সেই কমনীয়তার কিছুটা অভাব পরিলক্ষিত হয়। রাজপরিবারের মাধ্যমেই মণিপুরী নৃত্যকলা ত্রিপুরার এসেছে। অনুমান করা যায় যে, ত্রিপুরার স্থানীয় প্রভাবে ঐ কমনীয় মণিপুরী নৃত্যে খানিকটা যেন উদ্দামতা এসেছে—বিশেষ করে পুং চোলম নৃত্যের ক্ষেত্রে ধারণা করা যায় যে, লোকপ্রভাবজাত কিছু কিছু উদ্দাম অঙ্গভঙ্গীর অনুপ্রবেশ ত্রিপুরার অন্তর্গত মণিপুরী নাচে ঘটেছে। নৃত্যকলার ধর্ম গতিশীলতা। বর্তমানে মণিপুরী নৃত্যকলায় প্রচুর পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন হয়েছে। মণিপুরী নৃত্যকলা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে এবং হচ্ছে। ভবিষ্যতে আরো হবে। প্রত্যেক গতিশীল বস্তুর উপর স্থানের কিছুটা প্রভাব পড়ে। শিল্পের মধ্যে নৃত্যকলা যেহেতু সঞ্চারণশীল সেহেতু মণিপুর থেকে মণিপুরী নৃত্যকলার ত্রিপুরাতে প্রচার ও প্রসারতা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন ত্রিপুরার নিজস্ব সাংস্কৃতিকএকটি ছাপ এর মধ্যে পড়ে। একে মণিপুরের মণিপুরী নৃত্য থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র করে তোলে। মণিপুরী নৃত্যের পোষাকের ক্ষেত্রেও ত্রিপুরার মণিপুরী নৃত্যে স্বতন্ত্রতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন রাসনৃত্যে ঘাগড়ার উপরে একটি ওড়না দুভাঁজ করে স্তু এর আকারে দেহের দুপাশে ঝুলিয়ে দেওয়া হত। মণিপুরী রাসনৃত্যে মাথায় চূড়া বেঁধে স্বচ্ছ ওড়না দিয়ে মুখ আবৃত রাখার বিধি থাকলেও এখানে মুখ খোলা অবস্থাতে নৃত্য করা হয়।

সর্বশেষে ত্রিপুরার মণিপুরী নৃত্যের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সম্মানজনিত মাত্রা যোগ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্রিপুরাতে এসে তৎকালীন ত্রিপুরায় চর্চিত মণিপুরী নৃত্য দেখে এই নৃত্যকলার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং শান্তিনিকেতনে এই নৃত্যকলা শিক্ষা দেবার জন্য অনুপ্রাণিত হন। এই কথা সর্বজনবিদিত।

কবি সাতবার ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় এসেছিলেন। মহারাজকুমার স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মন (লালুকর্তা) এর কন্যা মলিনা দেবীর স্মৃতি চারণায় জানা যায় যে রবীন্দ্রনাথ শেষবার আগরতলায় এসে লালুকর্তার বাড়ীতে যে মণিপুরী রাস নৃত্য দেখেন সেটি ছিল মহারাস। মলিনা দেবী এতে বৃন্দার ভূমিকা করেছিলেন। লালুকর্তার বাড়ীর আঙ্গিনায় (বর্তমানে মহিলা কলেজ) এই রাসনৃত্য দেখেই রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়ে শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্য শিক্ষা প্রচলনের অভিলাষ ব্যক্ত করেন। এ সম্পর্কে 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' গ্রন্থে স্বর্গীয় সত্যরঞ্জন বসু 'ত্রিপুরায় রবীন্দ্র স্মৃতি' আলোচনায় বলেন যে, "............সন্ধ্যায় মহারাজকুমার এর বাড়ীতে কবি রাসনৃত্য উপভোগ করেন। ব্রজেন্দ্র কিশোরের বাড়ীর মেয়েরা রবীন্দ্রনাথকে দেখাবার জন্য কিছুদিন যাবৎ রাসনৃত্য তালিম দিতেছিলেন। দিব্যশ্রী সৌষ্ঠব মন্ডিতা বালিকাদের নৃত্যসজ্জা---বিশেষভাবে পুষ্পাবরণসজ্জা অপূর্ব। দীর্ঘ তাল-লয় যোগে মৃদঙ্গ ও মন্দিরার তালে তালে তাঁহাদের পদসঞ্চালন—লীলায়িত দেহ লতিকায়ে নানা মুদ্রার অঙ্গুলী বিন্যাস—মৃদুমধুর সুললিত কণ্ঠে অপূর্ব সঙ্গীতে পুষ্পপত্র শোভিত রাসমন্ডপে এক অপরূপ শোভার সমাবেশ কবি মুগ্ধনেত্রে যেন বৃন্দাবনের অভিসারিণীদেরই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ইহা দেখায় আমার পূর্ববঙ্গে আসা সার্থক হল"—এই কথাই তখন কবির মুখে এসেছিল।

পরবর্তী সময়ে কবি মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে আলাপ আলোচনাকালে মণিপুরী নৃত্যাদি শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য একজন শিক্ষক দেবার জন্য অনুরোধ করেন। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার অল্পপরেই মহারাজের ব্যবস্থায় ত্রিপুরাবাসী মণিপুরী নৃত্যকার শিল্পী স্বর্গীয় বুদ্ধিমন্ত সিংহ আগরতলা থেকে শান্তিনিকেতনে প্রেরিত হন।

ত্রিপুরা থেকে মণিপুরী নৃত্যগুরু পর পর যথাক্রমে বুদ্ধিমন্ত সিংহ, নবকুমার সিংহ, কুমুদ সিংহ, বসন্ত সিংহ, রাজকুমার চন্দ্রজিৎ সিংহ প্রমুখ শান্তিনিকেতনে গিয়ে নৃত্য শিক্ষা দেন। এঁদের মধ্যে শান্তিনিকেতনের নৃত্যনাট্যের প্রধান রূপকার হিসাবে স্বর্গীয় নবকুমার সিংহের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। গুরু নবকুমার সিং কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের সঙ্গে মণিপুরী নৃত্যের আঙ্গিক মিশিয়ে শান্তিনিকেতনে নৃত্যের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেন।

একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হয় না যে, শান্তিনিকেতনের নৃত্যের ইতিহাসে ত্রিপুরার চর্চিত মণিপুরী নৃত্যকলার ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং ত্রিপুরার এই মণিপুরী নৃত্যধারা শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

নাটকে সঙ্গীত ঃ ভাস ও কালিদাস

■ রামেশ্বর ভট্টাচার্য

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের প্রস্তাবনায় গ্রীষ্মকালকে নিয়ে একটি 'রাগবদ্ধ' সঙ্গীতের পরিবেশনা করেছেন নটী। সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় রঙ্গভূমিতে উপস্থিত প্রতিটি দর্শকই চিত্রপটে 'আলিখিত' ছবির মতো হতবাক্, বিমুগ্ধ, এমনকি সূত্রধারও ভুলে গেছেন তাঁর কর্তব্যের কথা। 'সারঙ্গ' রাগে অনুলিপ্ত সঙ্গীতটি গ্রীষ্মকালের আবহের প্রাণচঞ্চলতাকে ফুটিয়ে তুলেছে। 'সারঙ্গ' শব্দের অর্থ হরিণ, তবে রাগ হিসেবে 'সারঙ্গ' কালিদাসের কালে 'গৌড়ী' বা 'বৃন্দাবনী' প্রভৃতিতে বিভাজিত হয়নি বলেই মনে হয়।

'শকুন্তলা' নাটকে আরেকটি পরিপূর্ণ সঙ্গীতের অবতারণা করা হয়েছে নাটকের পঞ্চম দৃশ্যে। দুষ্যন্তের রাজবাড়ীতে সঙ্গীতভবন থেকে ভেসে আসছে শুদ্ধ সঙ্গীতের আলাপ। বিদূষক রাজাকে বলছেন—'ভো বয়স্য, সঙ্গীত শালান্তরে অবধানং দেহি, কলবিশুদ্ধায়া গীতেঃ স্বরঃ সংযোগ শ্রূয়তে। জানে তত্রভবতী বর্ণ পরিচয়ং করোতি'। শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ দুষ্যন্তকে কটাক্ষ করে সঙ্গীতটি পরিবেশন করেছিলেন রাজার আরেক মহিষী, অধুনা অবহেলিতা হংসপদিকা। আধুনিক কালের কবি কালিদাস রায় সঙ্গীতটির স-ছন্দ অনুবাদ করেছেন এই ভাবে—

"চুতমঞ্জরী চুম্বন করি'
সুখে বিরাজিছ কমলে এসে
নব মধু পানে, কেমনে
মধুকর, তারে ভুলিলে শেষে।"

রাজন্য সংস্কৃতির অঙ্গনে বণিতা-বিলাস কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। দুষ্যন্ত যে মধুকর বৃত্তির জন্য প্রাক্তন প্রণয়িণীর কাছে কিঞ্চিৎ তিরস্কৃত হয়েছেন, তাতে নাটকের চমৎকৃতিই ঘটেছে। পুরুষের চঞ্চলতার কথা যেমন বৈদিক সাহিত্যে, ইন্দ্রের স্তুতিতে সুলভ, অনুরূপ ভাবে, বৈষ্ণব সাহিত্যেও একাধিক উদাহরণ মেলে। শ্রীরাধিকার প্রতি দূতীর উক্তিতে পুরুষের 'চঞ্চল' মধুপবৃত্তির কথা বলা হয়েছে বিদ্যাপতির পদে—

"পুরুষক চঞ্চল সহজ সভাব।
কএ মধুপান দহও দিস ধাব।।"

শ্রীরাধাও অভিমান করে বলেছেন, যেমন বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতায়—

"পুরুষ ভ্রমর দুই হো এক মান
নানা থান ভ্রমি ভ্রমি করহ মধুপান।"

হংসপদিকার দ্বারা তিরস্কৃত হলেও দুষ্যন্ত কিন্তু গানের তারিফ করতে ভুলেন নি। গান শুনে মুগ্ধ হয়ে রাজা বলে উঠলেন—"অহো, রাগপরিবাহিণী গীতিঃ।" কালিদাসের টীকাকার রাঘব ভট্ট এ প্রসঙ্গটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন, হংসপদিকা সঙ্গীতের বর্ণ পরিচয় করেছেন। আর বর্ণপরিচয় কথাটির অর্থ বিশ্লেষণ করে বলা হল—

"গানক্রিয়োচ্যতে বর্ণঃ স চতুর্ধা নিরুপিতঃ।
স্থায়্যারোহ্যবরোহী চ সঞ্চারী।"

অর্থাৎ স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী সহ যেখানে গানের পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করা হয়, তাকে 'বর্ণপরিচয়' বলে। বর্ণপরিচয়ের কালে ধ্বনি হবে অস্ফুট অথচ মধুর---'কলা মধুরাস্ফুটধ্বনিযুক্তা।' হংসপদিকার সঙ্গীতের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-র টীকাকার রাঘব ভট্ট বলেছেন, সঙ্গীতটি 'শুদ্ধা' নামের গীতির অন্তর্ভুক্ত। এবং তার উদ্ভব হয়েছে 'গ্রামরাগ' থেকে।

ভরত-র 'নাট্যশাস্ত্র' রচনার পরবর্তী কালে মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাব। কালিদাস ও তাঁর পরবর্তীকালের সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে নৃত্য-গীত বাদ্য সমন্বিত সঙ্গীতের বহুল প্রয়োগ রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সব নাট্যকারই ভরতের নাট্যশাস্ত্রের বিধি নিয়ম অনুসরণ করেছেন যথাযথভাবে।

নাট্যশাস্ত্র-র রচয়িতা ভরতের পূর্ববর্তী অন্যতম নাট্যকার হলেন মহাকবি ভাস। তিনি কালিদাসেরও পূর্ববর্তী। ভাস তেরোটি নাটক-রচনা করেছেন। বিশ্লেষণ করে সমালোচকগণ দেখিয়েছেন যে, কালিদাস ভাস-র কাছে সর্বতোভাবে ঋণী। চিত্রকল্পের নির্মিতি, নাট্য প্রকরণ, অনেক ক্ষেত্রেই কালিদাস ভাসের অনুসরণ করেছেন। ভাসও তার নাটকে সঙ্গীতের অবতারণা করেছেন। 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' ভাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। নাটকের নায়ক উদয়ন সঙ্গীত বিশারদ। বিশেষত বীণা-বাদনে পারঙ্গম। নায়িকা বাসবদত্তাকে বীণাবাদন শেখাতেন উদয়ন। দু'জনের মধ্যে পরিচিতি ও সান্নিধ্য অবশেষে গান্ধর্ব-বিবাহে পরিণতি লভি করে। বাসবদত্তা যে বীণাটি বাজাতেন তার নাম ছিল 'ঘোষবতী'।

বাসবদত্তার বীণা-বাদন শিক্ষার পর্বটিকে মহাকবি ভাস খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। সহাস্য বাক্যালাপেই যেন সময় কেটে যেতো। আর উদয়ন যখন বীণার তন্ত্রীতে ঝংকার তুলতেন, তখন বাসবদত্তা নিবিড়ভাবে তাকিয়ে থাকতেন উদয়নের দিকে। বীণার তন্ত্রীতে অঙ্গুলি স্পর্শ করতেন না। শুধু আন্দোলিত হত তার পেলব-তনু আর সঞ্চারী-মন। বাসবদত্তা ঠিক কি ধরনের বীণা বাজাতেন সে বিষয়ে নাটকের টীকাকার বিশেষ কিছু উল্লেখ করেন নি। প্রাচীন কালে একতন্ত্রী থেকে সহস্র-তন্ত্রী নানা বিচিত্র ধরনের বীণার প্রচলন ছিল। মহতী, কচ্ছপী, সরস্বতী, ত্রিতন্ত্রী, কিন্নরী, রুদ্র, নারদীয়, নাদেশ্বর, ভরত-কতো বিচিত্র সে-সব বীণার নাম। তন্ত্রীবাদ্য সম্পর্কে নানা বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গীত বিষয়ক নানা গ্রন্থে। তাছাড়া, 'অগ্নিপুরাণ', 'বায়ুপুরাণ', 'মার্কন্ডেয় পুরাণ', 'বিষ্ণু ধর্মোত্তর' পুরাণেও সঙ্গীত সম্বন্ধে গভীর আলোচনা দেখা যায়। 'উড্ডীশ মহামন্ত্রোদয়', 'চতুর্দণ্ডী প্রকাশ', 'বীণালক্ষণ' প্রভৃতি গ্রন্থে 'তন্ত্রী' সঙ্গীতের আলোচনা উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষকের প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগে বাসবদত্তার হাত থেকে বীণার ছড় পড়ে গেলেও 'গাত্রবীণা'-র সহযোগে সুর-তাল-লয় সুরক্ষিত ছিল বলে মনে হয়। 'গাত্রবীণা' সম্পর্কে 'নারদীয় শিক্ষা'-য় কৌতুহল সঞ্চারী আলোচনা রয়েছে। নারদ প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম কাণ্ডে বলেছেন, গান-জাতিতে দু'প্রকার বীণা আছে। যথা দারবী বীণা ও গাত্রবীণা। প্রথমটি কাষ্ঠ নির্মিত ও দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রের ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলকে বীণার মতো ব্যবহার করে নেয়া। সাম-গায়কগণ প্রাচীন কালে এই গাত্রবীণার ব্যবহার করতেন।

"দারবী গাত্রবীণা-চ দ্বে বীণে গানজাতিষু।
সামিকো গাত্রবীণা তু তস্যাঃ শৃণুত লক্ষণম্।।"

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠিতে মা, পা তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠার মধ্য পর্বে যথাক্রমে গা, রি, সা,ধা এবং কনিষ্ঠার সন্ধিস্থলে নি-এই সাতটি স্বরের পরিচিতি প্রকাশ করতো। একটি স্বর থেকে আরেকটি স্বরে যাবার অন্তর যব বা তিল পরিমাণ মাত্র। একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে নারদীয় শিক্ষায় বিষয়টি বিবৃত করা হয়েছে।

"অভ্রমধ্যে যথা বিদ্যুৎ দৃশ্যতে মণিসূত্রবত্।
কেশচ্ছেদে বিবৃত্তীনাং যথা বালেষু কর্তারি।।১১।।"

মেঘের মধ্যে যেমন বিদ্যুৎকে অতি দ্রুত ক্ষীণসূত্রের মতো দেখা যায়, তেমনি বিবৃত্তি সমূহের বিরাম হবে চুলকাটার সময় কাঁচি সঞ্চালন কালে যে সামান্য বিরাম ঘটে সেরকম। নারদ আরো বলেছেন, এক স্বর থেকে অন্য স্বরে সংক্রমণের সময় দুই স্বরের সংযোগ স্থলে বেগ (Stress) প্রয়োগ করা উচিত নয়। ছায়া থেকে রৌদ্রে যেমন সুক্ষ্মভাবে সংক্রমিত হয়, তেমনি স্বর থেকে স্বরান্তর গমনও অবিচ্ছিন্নভাবে হওয়া উচিত। আমরা অনুমান করতে পারি, ভাস-র নাটকের নায়িকা বাসবদত্তা দারবী ও গাত্রবীণা দু'টিতেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন সার্থক গৃহ-শিক্ষক উদয়নের কাছ থেকে।

প্রসঙ্গত ভরত তার নাট্যশাস্ত্রের অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে যন্ত্রসঙ্গীতের নানা বিধিনিয়ম বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন। তার মতে স্বরের দু'টি মূল— কাষ্ঠবীণা ও কণ্ঠবীণা। অর্থাৎ দারবী ও গাত্রবীণা।

নাট্যশাস্ত্রের অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে ঃ—

"স্বরগ্রামৌ মূর্চ্ছনাশ্চ তানা স্থানানি বৃত্তয়ঃ।
স্বরসাধারণে বর্ণা হ্যলংকারা সধাতবঃ।
শ্রুতয়ো জাতয়শ্চৈব বিধিস্বর সমাশ্রয়াঃ।
দারব্যাং সমবায়োহয়ং বীণায়াংসমুদাহৃতঃ।।"

স্বর, গ্রাম, মূর্চ্ছনা, তাল, স্থান, বৃত্তি, সাধারণ স্বর, বর্ণ, অলংকার, ধাতু, শ্রুতি ও বিধিস্বর গঠিত জাতি সবই যুক্ত থাকে দারবী বীণায়। সে-ক্ষেত্রে কণ্ঠবীণা বা গাত্রবীণায় যুক্ত রয়েছে স্বর, গ্রাম, অলংকার, বর্ণ স্থান, জাতি ও সাধারণ স্বর। ভরত বলেছেন—

"স্বরগ্রামাবলংকারা বর্ণাঃ স্থানানি জাতয়ঃ।
সাধারণে চ শরীয্যাং বীণায়ামেষ সংগ্রহঃ।।"

ভাস থেকে কালিদাসের কাল পর্যন্ত নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি বিবর্তনের ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়। ভরতের পূর্ববর্তী ভাস বীণা অর্থাৎ যন্ত্র সঙ্গীতের ব্যবহার করেছেন গুরুত্ব সহকারে তার নাটক স্বপ্নবাসবদত্তায়। আর, ভরতের পরবর্তীকালে কালিদাস প্রয়োগ করেছেন কণ্ঠবীণা অর্থাৎ গাত্রবীণা-র। অবশ্য গাত্রবীণা বা কণ্ঠবীণা কথাটিই একসময় অপ্রচলিত হয়ে উঠে। জনপ্রিয় হয় কণ্ঠ সঙ্গীত। সঙ্গীত রত্নাকরের মতো গ্রন্থে শরীরজাত সঙ্গীতের উপর এতোটাই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে পুরো একটি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে শরীর বিদ্যা, আধুনিক পরিভাষায় যাকে বলা যায় Human Physiology। ভরত বীণার মতো তত বাদ্যের উপর গুরুত্ব দিলেও কালের ধারায় বীণা শুধুমাত্র শোভিত হল সরস্বতীর রঞ্জিত হস্তে।

যাইহোক, বাসবদত্তা-র 'ঘোষবতী' বীণাই ভাসের নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র হয়ে উঠল। হারিয়ে যাওয়া 'ঘোষবতী'-কে হঠাৎ ফিরে পেয়ে নাটকের নায়ক উদয়নের পূর্বস্মৃতি জেগে উঠে। নানা নাটকীয় কাহিনী বিন্যাসের মধ্য দিয়ে উদয়ন ও বাসবদত্তার পুনর্মিলন সংসাধিত হয়। ভাসের বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের এই নাটকের অনুসরণেই অর্বাচীন কালে কালিদাস অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়কের কাহিনী উপন্যস্ত করেন শকুন্তলা নাটকে। ধীবরের কাছ থেকে 'দুষ্যন্ত' নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কটি ফিরে পান রাজা। বুঝতে পারেন, কুহক মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে বা দুর্বাসার অভিশাপের কারণে বিবাহিত স্ত্রী শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করে অত্যন্ত অন্যায় আচরণ করেছিলেন রাজা দুষ্যন্ত। অবশ্য এখানেও পুনর্মিলনে পরিসমাপ্তি ঘটে এই সুখদ নাটকের। দুটি নাটকেই সঙ্গীতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহার যে শোভাজনক সে-বিষয়ে ভরতের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে—

"এবং গানং চ বাদ্যং নাট্যং চ বিবিধাশ্রয়ম্।
অলাতচক্রপ্রতিমং কর্তব্যং নাট্যযোক্তৃভিঃ।।"

ভরত নাটকের ক্ষেত্রে গান, বাদ্য ও অভিনয় এই তিনটির সমান গুরুত্ব দিলেও পরবর্তী কালে মঞ্চ নাটক হয়ে উঠে অভিনয় প্রধান। গান স্বতন্ত্র কণ্ঠশিল্প হিসাবে উজ্জ্বলতর স্বীকৃতি লাভ করে। বাদ্য হয়ে উঠে অভিজাত নৃত্য ও গীতির সহযোগী, আর ব্রাত্য জনপরিসরের বিনোদনের উপকরণ যাত্রাপালা ও কীর্তনের প্রধান অবলম্বন। এই রূপান্তরের আভাসই সম্ভবত সুপ্ত ছিল ভাস ও কালিদাসের নাটকে সঙ্গীতের প্রয়োগের ক্ষেত্রে।

সঙ্গীত শিল্পী প্রতিভা বসু

■ মণিকা দাস

'রাণুর কণ্ঠ নজরুলকে মুগ্ধ করেছিল। নিজের গানের কলস থেকে সঙ্গীতসুধা তিনি রাণুর কণ্ঠে ঢেলে দিতে চেয়েছেন। রাণুকে তিনি নিজের হাতে একটি শংসাপত্র লিখে দিয়েছিলেন....... শ্রীমতী রাণু সোম কল্যাণীয়াসু/মাটির উর্ধ্বে গান গেয়ে ফেরে/ স্বরগের যত পাখি/ তোমার কণ্ঠে গিয়াছে তাহারা। তাদের কণ্ঠ রাখি/যে গন্ধর্বলোকের স্বপন। হেরি মোরা নিশিদিন/ তুমি আনিয়াছ কণ্ঠ ভরিয়া/ তাদের মুরলী বীণ। তুমি আনিয়াছ শুধু সুরে সুরে। ভাষাহীন আবেদন, যে সুরমায়ায় বিকশিয়া উঠে/শশী তারা অগণন। যে সুরে স্বরগে স্তবগান গাহে/ সুন্দর সুরধনী/অসুন্দর এই ধরায় তোমার/কণ্ঠে সে গান শুনি।" ১৩৩৫ এর ৭ আষাঢ়ে লেখা ঢাকার বনগ্রামে রাণু ওরফে প্রতিভা বসুদের বাড়িতে বসে কাজী নজরুল ইসলাম এই শংসাপত্রটি নিজের হাতে লিখে দিয়েছিলেন তার প্রিয় ছাত্রী রাণুকে।"[১]

কে এই রাণু? আজকের তারিখে হয়ত সেইরকম ভাবে কেউ আর রাণুর গানের প্রশংসা করবে না যেই রকমভাবে প্রশংসা করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, দিলীপ কুমার রায় এবং বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ ঢাকা ও কলকাতায় অবস্থিত আরো বহু জ্ঞানী-গুণী জন। এমনকি স্বয়ং আনন্দময়ী মা-ও যার গান শুনতে শুনতে ধ্যানমগ্ন হয়ে ভাবসমাধি লাভ করতেন। এই রাণুই পরবর্তী সময়ের জনপ্রিয় বাংলা সাহিত্যিক প্রতিভা বসু (১৯১৫-২০০৬)। ক্ষণজন্মা ছিলেন এই রাণু। নইলে একই সঙ্গে দিলীপ কুমার রায় থেকে শুরু করে কাজী নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে গান শেখার সৌভাগ্যসুযোগ হয়ত আর কারোরই হয়নি। কিভাবে ঘটলো এই সংযোগ? তাঁর আলোচনা করতে এবং হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের খোঁজ করতেই আজকের এই প্রবন্ধের অবতারণা।

রাণুর জন্ম হয়েছিল ১৯১৫ সালের মার্চ মাসের দোল পূর্ণিমা তিথিতে। তাঁর পিতা ছিলেন শ্রী আশুতোষ সোম ও মাতা শ্রীমতী সরযূবালা সোম। বিক্রমপুর জেলার হাঁসাড়া গ্রাম ছিল রাণুর পিতামহ-প্রপিতাপমহদের বাস। যদিও পেশায় কৃষি-আধিকারিক পিতার চাকুরিস্থল ঢাকাতেই রাণুর ছেলেবেলা কেটেছে। ঢাকাতেই পড়াশোনা, সঙ্গীত শিক্ষা ও পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান সমান্তরালে চলেছে। ঢাকার বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী লীলা রায়ের সঙ্গে ও আদর্শে স্বাধীনতার মিটিং মিছিলে যোগ দেওয়া, বিভিন্ন সভা সমিতিতে গান করা, সরলা দেবীর আহ্বানে 'বীরাষ্টমী' ব্রত উপলক্ষে 'মায়ার খেলা'তে গান গাইতে কলকাতায় আসা, বাড়ীর সকলে মিলে নাটক করা, এমনকি ঢাকায় অ্যালবার্ট হল ভাড়া নিয়ে সেই সময়ে যা মোটেও প্রচলিত ছিল না মেয়ে ছেলে মিলে নাটক করে এক নজির বিহীন ইতিহাস গড়ে তোলা প্রভৃতি সবকিছু মিলে জীবনের একটা বর্ণময় অধ্যায় তিনি কাটিয়েছিলেন সেই সময়ে।

পিতামাতার উৎসাহ সাহচর্য ও পৃষ্ঠপোষকতাতেই রাণুর সঙ্গীতজীবন শুরু হয়। হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান গাইতে জানা মা সরযূবালা ও সঙ্গীতপ্রেমী পিতা আশুতোষ সোমের সুকণ্ঠের জীনগত উত্তরাধিকারী ছিলেন রাণু প্রকৃতিগতভাবেই। খুব ছোটবেলা থেকেই সঙ্গীতের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করে পিতা-মাতা-কাকা-পিসি সকলেই কোনো গায়ক দেখলেই তাকে ধরে নিয়ে আসতেন এবং ওই গায়কের কাছ থেকে রাণুকে দুটো একটা গান শিখে নিতে বলতেন। রাণুরও গান শেখার ব্যাপারে একাগ্রতা এইরকম ছিল যে রাস্তা দিয়ে যদি কেউ গান গেয়ে চলে যেত একবার শোনামাত্র সেই গান যেমন মুখস্থ করে নিতে পারতেন তেমনিই ব্লটিং পেপারের মত গলায়ও তুলে নিতে পারতেন। নিজের গান সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, "গান আমি কোথায় শিখেছিলাম কবে শিখেছিলাম সে আমার মনে নেই। জ্ঞান হয়ে থেকেই দেখছি বাড়িতে একটা ছোট্ট হারমোনিয়াম আছে। মা বাজাতেন। মায়ের দেখাদেখি আমিও প্যাঁ পোঁ করতে করতে কখন শিখে গেছি।"[২] তাঁর এক মামা যাকে তিনি কালামামা বলে ডাকতেন তিনি এই ছোট্ট ছোট্ট হাতে হারমোনিয়াম বাজানো দেখতে খুবই ভালোবাসতেন। আর গলা মিলিয়ে রাণু যখন গান গাওয়া শুরু করতেন তখন তিনি রাণুর মাকে বলতেন, "সরযূ মেয়েটাকে কত কোকিল ভাজা খাইয়েছিল বল তো?"[৩]

ঢাকা আসার পর গুরুর কাছে সঙ্গীত শেখা শুরু হয় রাণুর। তাঁর প্রথম সঙ্গীতগুরু চারু দত্ত খুব যত্নের সঙ্গে তাঁকে শেখাতেন এবং তাঁর স্বপ্ন ছিল এই ছাত্রীকে দিয়ে মিউজিক কনফারেন্সে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত গাওয়াবেন। কিন্তু স্বপ্নপূরণ হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর একে একে রাণু ঠুংরী গায়ক মেহেদি হোসেন, এলাহাবাদের সঙ্গীতজ্ঞ ভোলানাথ মহারাজের পর আগ্রা প্রফেসর গোল মহম্মদ

খাঁর কাছে একেবারে নাড়া বেঁধেই টানা চার বছর খেয়াল ও ঠুংরী শিখেছিলেন এবং মাত্র এগার বছর বয়সেই 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে তাঁর গাওয়া গানের রেকর্ড বেরিয়েছিল। তখনো মাইকের প্রচলন ছিল না, ধুতুরা ফুলের মতো দেখতে এক মস্ত বড়ো চুঙির ভিতর দিয়ে গান গাইতে হত। কলকাতা থেকে কোম্পানির লোকেরা গিয়ে ঢাকার টিকাটুলিতে অবস্থিত সুশুংয়ের রাজার বাড়িতে মেশিন ফিট করেছিল। প্রথমবার যে তিন-চারটি গান রেকর্ড করা হয়েছিল সেগুলির একটি ছিল অতুলপ্রসাদ সেনের 'বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখি পাতে'। দ্বিতীয় বারের রেকর্ডে বেরিয়েছিল প্রতিভা বসুর স্বরচিত কবিতাগুলি গান হয়ে। তারপর দীর্ঘদিন তিনি গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে প্রতি বছরে কমপক্ষে ছয়টি রেকর্ড করার জন্য চুক্তি বদ্ধ ছিলেন।

এই রেকর্ডগুলোর বের হওয়ার পর থেকে ক্রমশ রাণুর নাম মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং নানান জায়গা থেকে গান করার নিমন্ত্রণ আসতে লাগল, নানা স্বদেশী সভাতে গিয়ে গান করার জন্য ডাক আসতে লাগল। স্বদেশী নেত্রী লীলা রায় রাণুর বাড়িতে চলে এলেন, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক অনন্ত সিং' এর ফাঁসির আদেশের বিরুদ্ধে মামলা লড়তে টাকার প্রয়োজন আর তাই তিনি রাণুকে নিয়ে যেতে যান জমিদার বাড়িতে গান শুনিয়ে টাকা তোলার জন্য। এই ঘটনার স্মৃতিচারণ তিনি তাঁর 'জীবনের জলছবি' গ্রন্থে করেছেন, "ফাঁসি রদ্ করবার জন্য মামলা চালানো হচ্ছে কিন্তু টাকার দরকার। সেই টাকা তুলতে অনন্ত সিং-এর দিদি ঢাকা এসেছেন। লীলাদি সেই টাকা তুলে দেবার ভার নিয়েছেন। সেই কারণেই নবাব বাড়ি যাবেন টাকা তুলতে। গাড়ি সেই দিকেই ছুটলো, আমাদের নিয়ে বাড়ির অন্দরমহলের দেউড়িতে গিয়ে ঢুকলো। কোন্ মঞ্জিলে গেলাম তা আমার জানা নেই, লীলাদি যেখানে নিয়ে যাচ্ছেন সেখানেই যাচ্ছি অন্ধের মতো। মেঝেতে পাতা মখ্‌মলের গদিতে বসানো হল আমাদের। তবকমোড়া সন্দেশ আর শরবৎ দিয়ে আপ্যায়ন করা হলো। তারপর পর্দা সরিয়ে বেগম সাহেবা এলেন। সঙ্গে তিন চার জন দাসী এবং সুন্দরী সুসজ্জিতা কয়েকজন মেয়ে বৌ।... শোনানো হল গান। একটার পর একটা, পরিশ্রমে আমি ঘেমে গেলাম। বেগম সাহেবা মুদ্রিত চক্ষে শুনতে শুনতে একসময়ে চোখ খুলে বললেন "কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ" আমিও নিস্কৃতি পেলাম। তিনি ভাঙা বাংলায় বললেন, 'আমি বহুত খুসি হয়েছি"। খুশি হয়ে তিনি কত টাকা দিয়েছিলেন সেটা আমার জানবার কথা নয় তবে উপঢৌকন যা দিয়েছিলেন তা চোখে দেখলাম। তার মধ্যে ঝুড়ি ভর্তি আম আর লিচুর কথাই মনে আছে। কেননা ঐ আম আর লিচুর কিছু ভাগ আমাকেও দেওয়া হয়েছিল।,

তারও পরে আরো দু-চার জায়গায় গান করতে হয়েছে আমায়। শেষে শোনা গেল অনন্ত সিং এর দিদির হাতে লীলাদি দশ হাজার টাকা তুলে দিতে পেরেছেন। সেই থেকে আমার জীবনে অনন্ত সিং নাম একটা ইতিহাস, একটা অপার্থিব অস্তিত্ব। ফাঁসির হুকুম তাঁর রদ হয়েছিল, কিন্তু দ্বীপান্তর হলো"[৪]।

যাই হোক হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের খেয়াল ও ঠুংরীতে পারদর্শিনী রাণু যে পরবর্তী সময়ে বাংলা গানেও বিশেষ হয়ে উঠলেন তার প্রধান কারণ দিলীপ কুমার রায়, কাজী নজরুল ইসলাম এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই তিন জন মহান ব্যক্তি। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে অনুষ্ঠিত গানের জলসায় সঙ্গীত জগতের বিস্ময়পুরুষ গলার মডালেশনের প্রবর্তক দিলীপ কুমার রায়ের সঙ্গে রাণুর প্রথম পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটেছিল যা রাণু কোনোদিন ভুলেননি। রাণু জানিয়েছেন যে দিলীপ কুমার রায়ের সঙ্গে পরিচয় হবার আগে তিনি বাংলা গান খুব একটা জানতেন না আর যা জানতেন তাও বলা যায় ভুল সুরে। দিলীপ কুমার রায়ই রাণু সোম ওরফে প্রতিভা সোমের মধ্যে সর্বপ্রথম সঙ্গীত প্রতিভার আবিষ্কার করলেন এবং তাকে নিজের গান থেকে শুরু করে অতুল প্রসাদী, দ্বিজেন্দ্রগীতি ও নজরুলগীতি প্রভৃতি নানাধরনের গান গাইতে শেখালেন এবং এতেই সন্তুষ্ট রইলেন না চিঠি লিখে বন্ধু নজরুল ইসলামকে তো রাণু সম্পর্কে জানালেনই রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত চিঠিতে রাণুর সঙ্গীত প্রতিভা সম্বন্ধে অবহিত করলেন। দিলীপ কুমার রায় সম্পর্কে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে প্রতিভা বসু লিখেছেন, "দিলীপ কুমার রায় সঙ্গীত জগতের এক মূর্তিমান বিস্ময়। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তিনি খ্যাতনামা ব্যক্তি। ...অত্যন্ত রূপবান কণ্ঠস্বরের লালিত্য গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মতো তাঁর তুলনা তিনিই। ...গলার মডালেশান যাকে বলে দিলীপ কুমার রায়ই তার প্রবর্তক। গলাকে প্রয়োজনে হাওয়ার মতো বইয়ে দেওয়া, মৃদঙ্গের বোলের মতো গুড় গুড় করে তোলা, মীড়ে গমকে মূর্ছনায় অর্থবহ করা এইসব কারুকর্ম তাঁর কণ্ঠস্বরে অনায়াসলভ্য ছিলো। পণ্ডিত জগতেও তিনি একজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব তখন ...বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে অতিথি হয়েছে...আমিও খবরটা পেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। ...সে সময়ে যে তিনটি যুবক সারা বাংলার গর্ব বলে আলোড়ন তুলে ফেলেছিল তার মধ্যে একজন সুভাষ চন্দ্র বসু, একজন নজরুল ইসলাম আর একজন দিলীপ কুমার রায়। এই তিনজনের নাম সকলের মুখে মুখে। ...প্রথমে গানের জলসা বসছে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে। যে বাড়ি আমাদের অনধিগম্য। ...মন শান্ত করেই ছিলাম অশান্ত হলাম সত্যেন বসুর নিজের লেখা একটি চিঠি পেয়ে। বাবাকে লিখেছেন 'আপনি সপরিবারে এলে খুশি হবো। উনি কতোটা খুশী হয়েছিলেন জানি না, আমরা যে কতো খুশী হয়েছিলাম, কতো সম্মানিত বোধ করেছিলাম তার কোনো বর্ণনা নেই।"[৫]

সেইদিন গানের আসরে গিয়ে তিনি শুধু গান শুনেই ফিরতে পারলেন না তাঁকেও গাইতে হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও দিলীপ কুমার রায়ের আগ্রহে। তারপর থেকেই শুরু হয় দিলীপ কুমার রায়ের কাছে সঙ্গীতের তালিম। কখনো সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে এসে আবার কখনো বা রাণুদের বাড়িতেই। ফলে জলসার নিমন্ত্রণটি ছিল রাণুর সঙ্গীত জীবনের একটি সুবর্ণ ফটক যেটি পার করেই ক্রমশ তিনি পৌঁছতে পেরেছিলেন সঙ্গীত জ্ঞানীদের শিশ্‌মহলে যাঁদের বড়ত্ব মহত্বের ছোঁয়ায় রাণুর শুধুমাত্র সঙ্গীত জীবনেরই উন্নতি হয়নি ব্যক্তি জীবনেও অনেক সু-প্রভাব পড়েছিল।

দিলীপ রায়ের চিঠির মাধ্যমেই সুকণ্ঠী রাণুর নাম নজরুলের কাছে পৌঁছেছিল। ফলে নজরুল নিজেই একদিন ঢাকা চলে আসলেন রাণুকে দেখার জন্য। নজরুলের সঙ্গে এই প্রথম দেখার স্মৃতিচারণ করেছেন প্রতিভা বসু সারাজীবনে বহুবার— "এক বিষণ্ণ বিকেলে

মন খারাপ করে দোতলার ঝোলানো বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম। একটি ফিটন এসে আমাদের দরজায় থামল।...সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে দরজা খুলে দেখলাম, বাঙালীর তুলনায় একটু বেশী স্বাস্থ্যবান এবং সুশ্রী এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়, একমুখ হেসে গায়ের গেরুয়া চাঁদর সামলাতে সামলাতে আমাকে ঠেলেই প্রায় ঢুকে এলেন ঘরে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'তুমি নিশ্চয়ই রাণু? বল ঠিক ধরেছি কিনা? তুমিই মন্টুর ছাত্রী তো? ' মন্টু মানে দিলীপদা। দিলীপদার ডাক নাম মন্টু। ...আমি নজরুল ইসলামকে কখনো দেখেনি—তবু খুব আশ্চর্যভাবেই মনে হলো এঁর নামই নজরুল ইসলাম। আমি রোমাঞ্চিত বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে বললাম, আপনি...আপনি কি—

'আমি নজরুল ইসলাম'। খোলা গলায় হাসলেন। নজরুল ইসলামের বয়স তখন বত্রিশ-তেত্রিশ অথবা কিছু বেশি। যৌবন তাঁর চোখে-মুখে, সারাক্ষণ হাসিতে সমস্ত শরীরে স্রোতের মতো বহমান, বেগবান। সেই বয়সে যারা তাঁকে দেখছেন তাঁদেরই বোঝানো যাবে কী দুকূলপ্লাবী আনন্দধারা দিয়ে গড়া তাঁর চরিত্র। মস্ত বড় কালো টানা চোখ, এলোমেলো ঘন চুলে বাবরি, তীক্ষ্ণ নাসিকা ঘষা তামার মতো রঙ, সহজ সরল অদাম্ভিক ব্যবহার, উদ্দাম হাসি, উচ্ছ্বাস প্রবণতা, সবটা মিলিয়ে একটা ব্যক্তিত্ব বটে। আর তাঁর ধুলোয় লুটিয়ে পড়া গেরুয়া চাঁদর!...নজরুল ইসলামের গানে তখন সারা দেশ পাগল। যার কোনো সুর নেই সেও মাথা দুলিয়ে আবেগ সহকারে 'কে বিদেশী বন উদাসী' টানে। তাছাড়া একটা লড়াই ফেরতা লোক বটে। বিপ্লবাত্মক বক্তৃতা দিয়ে ফাটিয়ে দিচ্ছেন দেশ, ছেলেরা উদ্বুদ্ধ হয়ে 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে' গাইতে গাইতে জেলের ফটকে ঢুকছে, প্রেমের গান গেয়ে এদিকে আমি রাতারাতি এতো নাম কিনে ফেলেছি যে ভক্ত সংখ্যা প্রায় অগণন।"[৬]

নজরুলকে পেয়ে যেমন রাণু সহ তাঁর বাড়ির লোকেরা খুশি হয়েছিল তেমনি নজরুলও খুব খুশি কারণ "মন্টু বলেছে—সে (রাণু) নাকি আমার গান এতো সুন্দর করে গায় যে তার জন্য আমিই বিখ্যাত হয়ে যাচ্ছি।"[৭] তাই তাঁর রাণুর সঙ্গে দেখা করার এত আগ্রহ ছিল। তারপর থেকে শুরু হল উচ্ছ্বাস সহকারে গান শেখা ও শেখানোর পালা। ঢাকার বন্ধু কাজী মোতাহার হোসেনের বাড়িতে নজরুল উঠেছিলেন। সেখানে রাত জেগে নতুন নতুন গান লিখতেন আর ভোর হলেই চলে আসতেন রাণুকে শেখাতে। রাণুকে দেখার পর প্রথম নজরুল যে গানটি লিখে তাঁকে শিখিয়েছিলেন সেই গানটি হল "কোন কূলে আজ ভিড়লো তরী, এ কোন সোনার গাঁয়/ ভাঁটির টানে আবার কেন উজান যেতে চায়।"[৮]

আবার একদিন পান ও চা বিলাসী নজরুল রাণুর মা'কে পেয়ালাভর্তি চা নিয়ে আসতে দেখে খুশি হয়ে বলে উঠেছিলেন 'নাহ: মার মতো মেয়ে হয় না' এবং সঙ্গে সঙ্গেই গেয়ে উঠেছিলেন 'এত চা ঐ পেয়ালায় এমন করে আনলে বল কে'— এর পরের দিনই এই কথা থেকে রচনা করলেন এই গানটি "এতো জল ও কাজল চোখে পাষাণী আনলে বল কে-"[৯] । এই ভাবে রাণুদের পরিবারের সঙ্গে নজরুলের একটা আত্মিক সম্পর্ক ও সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল। ঢাকার বর্ধমান হাউসে নজরুল ইসলামের বন্ধু অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন থাকতেন। তিনি সেখানেই থাকতেন। সারারাত ধরে গান লিখে সকালে সেইখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসতেন, এসেই বলতেন "মর্নিং ওয়াক হয়ে যাচ্ছে নিজে থেকে। মনে মনে একটা গান তৈরী করতে করতে হাঁটি, কখন যে পথ ফুরিয়ে যায় বুঝতেই পারি না।"[১০] নজরুল ইসলামের ব্যক্তিত্ব ও গান সম্পর্কে প্রতিভা বসু বলেছেন—"নজরুল ইসলামের গানের গলাটা ভাঙা ভাঙা ছিল সেই ভাঙা ভাঙা স্বরটাই ছিল ওঁর কণ্ঠস্বরের আসল বৈশিষ্ট্য। কী মিষ্টি সে সুর কী মন মাতানো! তবে গানের সময়ে তাকে দেখাও গানের একটা অঙ্গ। সুরের তরঙ্গে তাঁর সারা শরীর যেন তরঙ্গায়িত হয়ে উঠতো। চোখের মণি জ্বলজ্বল করতো, গানের প্রতি ভালোবাসার আবেগ লাবণ্যের আধার হয়ে ধরা দিত। গানের প্রাণ যেন মূর্ত হয়ে সারা ঘরের সব আবহাওয়াকে আবেগ লাবণ্যের আধার হয়ে ধরা দিত। গানের প্রাণ যেন মূর্ত হয়ে সারা ঘরের সব আবহাওয়াকে আনন্দ সাগরে ভাসিয়ে রাখতো ।। আমার মা বাবা দুজনেই সঙ্গীত পিপাসু, নজরুলেরও যেমন গান পেলে সময় জ্ঞান থাকতো না, আমার মা-বাবাও তাই। প্রথম দিনের পরিচয়েই নজরুল তাদের সময়ের কথা ভুলিয়ে দিয়ে একান্ত কাছের মানুষ হয়ে গেলেন, কখন ঘড়ির কাঁটা বেলা ছটা থেকে রাত দশটায় এসে কাঁপতে লাগল কারোরই মনে রইল না সে কথা।

নজরুল ইসলামের স্মৃতি মানেই হাতে হারমোনিয়াম, পাশে বাটা ভরা পা, ভাসা ভাসা গলায় আশ্চর্য সুর। মুখে একই সঙ্গে হাসি আর গান এবং তা অনর্গল।... যে মানুষ যুদ্ধে গিয়েছেন জেল খেটেছেন জেলের নিঃসঙ্গ কুঠুরির অন্ধকারে নির্বাসিত হয়েছেন, অনশন করেছেন, গায়ে গেরুয়া চাদর, মাথায় গান্ধী টুপি আর খদ্দরই যার একমাত্র ভূষণ—সেই মানুষই আবার কবিতার কম্পন সঙ্গীতের ঝঙ্কারে পাগল করে দিচ্ছেন মানুষকে— তাঁকে নিয়ে যে দেশ উন্মত্ত হয়ে উঠবে তাতে আর সন্দেহ কী?"[১১]

এইভাবে রাণুদের সঙ্গে নজরুলের সম্পর্ক অচিরেই অচ্ছেদ্য হল, একাত্মও হল যে দুই চার দিনের জন্য এসে অনেকদিন রয়ে গেলেন। নজরুল রাণুর মাকে মা বলেই ডাকতেন, যেন ঘরের ছেলে। এমনই একটা গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল নজরুলের রাণু ও তাঁর পরিবারের সকলের সঙ্গে। পরবর্তী সময়ে রাণু যখন কলকাতায় গান রেকর্ড করতে যেতেন তখন তাঁর পিসির বাড়িতে নজরুলও আসতেন ঘুম থেকে উঠেই রাণুর ডাক পড়ত গান শেখার জন্য। চুঁচুড়াতে বসেও নজরুল সেই সময়ে অনেক গান রচনা করেছিলেন এবং রাণুরও অনেক গান শেখা হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে নজরুলের কাছ থেকে তিনি অজস্র গানের সম্পদ পেয়েছিলেন। । 'চোখের চাতক' নামে নজরুল তাঁর গানের বইটিকে (প্রকাশকাল-১৩৩৬) 'কল্যাণীয়া বীণাকণ্ঠী প্রতিভা সোম জয়যুক্তাসু' এই লিখে রাণুকে উৎসর্গ করেছিলেন। পত্রালাপও চলেছে বহুদিন তাদের মধ্যে। নজরুল রাণুকে চিঠি লেখার জন্য ইট রং এর পার্কার কলম উপহার দিয়েছিলেন। সেই কলম দিয়ে নজরুলের প্রিয় বেগুনী রং এর কালি দিয়ে রাণু নজরুলের লেখা চিঠির উত্তর দিতেন। নজরুলের ইচ্ছেতে রাণু তাঁর হিজ মাস্টার্স ভয়েসের চুক্তিমাফিক পরবর্তী রেকর্ডে নজরুলের গানই রেকর্ড করলেন এবং এজন্য রাণুই

কোম্পানীকে অনুরোধ করেছিলেন যে তাঁর ট্রেইনার হিসেবে নজরুলকে নিযুক্ত করার জন্য। কোম্পানী রাণুর ইচ্ছেতেই নজরুলকে রাণুর ট্রেইনার হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। সেই যে কোম্পানীতে ঢুকেন আর বেরোতে পারেন নি শেষ পর্যন্ত। পরবর্তী সময়ে নজরুল হিজ মাস্টার্সের হয়ে আঙুরবালা, ইন্দুবালা, কানন দেবী তাদেরকে ট্রেনিং করাচ্ছিলেন। কোম্পানীর লোকেরা তাকে চা ও পান দিয়ে দরজা বন্ধ করে বসিয়ে দিয়ে গানও লিখিয়ে নিচ্ছিল অনবরত। পরের বার রাণুর সঙ্গে আবার দেখা হতেই জানিয়েছিলেন যে রাণু তাঁকে সোনার খাঁচায় ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন যা থেকে তিনি বেরোতে পারছেন না।

কলকাতায় রাণু এলে নলিনী সরকারের বাড়িতে গানের আসর বসত, সেখানে নলিনীকান্ত সরকার ও নজরুল ইসলাম থেকে শুরু করে অনাথনাথ বসু, শরৎচন্দ্র পণ্ডিত, এবং আফতাফউদ্দীনের মতো বড় বড় গাইয়ে বাজিয়েরা আসতেন। সে সময়ে তাদেরই উদ্যোগে প্রতিভা সোম অর্থাৎ রানু রেডিওতে গান করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন “নজরুল ইসলাম এবং নলিনীদা আমাকে একদিন রেডিয়োর আপিসে নিয়ে গেলেন। রেডিও তখন সরকারী আপিস নয়। নিয়ম কানুনের বিশেষ ধার ধারা হত না। নৃপেন মজুমদার ছিলেন কর্ণধার। তাঁর অনুরোধেই ওঁরা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি তখন সর্বত্রই নজরুল ইসলামের গান গেয়ে বেড়াই। সেখানেও নজরুলের গানই গেয়েছিলাম। পরের দিন বিভিন্ন সংবাদপত্রে খুব বাহবা বেরুলো। অবশ্য সেই বাহবাতে আমার নিজের কতোখানি অবদান সেটা বিচার্য বিষয়। গান তখন এসব ক্ষেত্রে বলা যায় প্রায় পেশাদার স্ত্রী পুরুষের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। ভদ্রঘরের মেয়েদের নাম হাতের এক আঙুলের মধ্যেই শেষ হয়ে যেত তার উপরে নজরুলের গানের চাহিদাও খুব বেশি। বাংলা শব্দের বন্ধনে উনি সুমিষ্ট উর্দু ভাষায় সুমিষ্ট গজলের সুর আরোপ করে এক নতুন চমকের সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুল প্রসাদ সেনের পরে কম্পোজার হিসেবে তাঁর নাম তখন সকল সঙ্গীত পিপাসুর মুখে মুখে। বস্তুত যুগপৎ রচয়িতা এবং সুরকার হিসেবে এই ধরনের গানে তিনি অবশ্যই অনন্য। সুতরাং এই বাহাবার অংশীদার নিশ্চয়ই আমি একা ছিলাম না। সমবেতভাবেই সেটা পেয়েছিলাম। আমার পৈতৃক পদবী সোম। কোনো কাগজ লিখেছিল এমন কণ্ঠ কি তাঁর পদবীর গুণেই সম্ভব হলো? নজরুল আর নলিনীদার খুশি দেখে কে ? বললেন, ঈশ্শ্! পদবীর জোরেই যার এই অবস্থা, সেই সোমরস পান করতে পারলে না জানি কত আনন্দ হতো। ”[১২]

নজরুল ও রাণুর মধ্যে ছিল স্নেহ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সম্মিলিত রূপ। “দেশ পত্রিকায় ‘নজরুল ইসলাম’ শিরোনামে প্রতিভা বসু লিখেছিলেন—‘আমার মতো একটা নগন্য সদ্য কিশোরীর জীবনে এক বিরাট ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে যে প্রচণ্ড সুখ ও সম্মান এনে দিয়েছিল তাঁর কোনো তুলনা নেই।’”[১৩]

কিন্তু নজরুল যে রাণুদের ঢাকা-বনগার বাড়িতে গান শেখাতে আসতেন এ ঘটনাকেও প্রতিবেশীরা সুনজরে দেখে নি। এই কারণে নজরুলকে রাণুদের পাড়ার ছেলেদের হাতে অপ্রীতিকরভাবে হেনস্থা হতে হয়েছিল আর বিনা দোষে লজ্জিত হতে হয়েছিল প্রতিভা বসুর পরিবারকে। এ প্রসঙ্গে প্রতিভা বসুর লেখায় পাই; “রেকর্ডিং শেষ, সুতরাং আর থাকার কোনো প্রশ্ন নেই। নজরুল ইসলাম গেরুয়া চাদর লুটিয়ে তুলে দিতে এলেন স্টেশনে। বললেন, ‘খুব শিগ্গির আবার চলে এসো’। আমার মা বললেন, আপনিও আরেকবার আসুন না—’

আমি কিছু বললাম না। বলতে পারলাম না। বলতে না পারার পেছনে শুধু যে আমার বিচ্ছেদের বেদনাই লুকিয়েছিল তাই নয়, তার চেয়েও আরো অনেক গভীর বেদনা আমাকে লজ্জা দিচ্ছিলো। সেবার ঢাকা গিয়ে নজরুল ইসলাম যেদিন ঢাকা ছেড়ে ফিরে গেলেন, তার দুদিন আগে সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়িতে তাঁর গান আর আবৃত্তির আসর বসেছিল। আসর ভাঙতে সামান্য দেরি হলো। সকলে চলে গেলে মা নজরুলকে খেতে দিলেন। রাত দশটা বেজে গেল। বাবা বললেন, ‘আপনি অপেক্ষা করুন, আমি সাইকেল দিয়ে গিয়ে একটা গাড়ি ডেকে আনি।’ উনি বললেন, ‘পাগল নাকি?’ আপনি গিয়ে আমার জন্য গাড়ি ডেকে আনবেন? সে কখনো হয়?’....নজরুল হেসে খুন, ‘আমার কি রাণুর মতো ভূতের ভয় আছে নাকি যে রাত বেশি হয়েছে বলে, পাড়া চুপ হয়ে গেছে বলে হেঁটে যেতে ভয় পাবো?’ গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে নেমে গেলেন রাস্তায়। .... নজরুল যখন বনগ্রামের মোড়ে একটা আরো নির্জন রাস্তায় পৌঁছেছেন, বোধ হয় সেটা ঠাটারি বাজারের মোড়, সেই মুখটাতে যেতেই জন সাত-আট ছেলে পেছন থেকে প্রচন্ড জোরে মাথায় আঘাত করতে করতে বললো, ‘দিলীপ রায়ের টাক মাথাটা ফাটাতে পারিনি, এবার তোর বাবরি চুলের মাথাটা আর আস্ত রাখবো না।’

নজরুল আচমকা আঘাত পেয়ে মুহূর্তের জন্য বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলেন বটে, পরক্ষণেই ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা ছেলেকে ধরে ফেলে তার হাতের লাঠি দিয়েই তাকে ধরাশায়ী করে সমানে সেই লাঠি বন বন করে ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, ‘কে আসবি আয়, কটা আসবি আয়,’ লাঠিখেলায় ছোরাখেলায় দক্ষ মেরুদন্ড সিধে একটা যুদ্ধফেরতা মানুষের সম্মুখে এই শৃগাল শূকরের দল কি কখনো দাঁড়াতে পারে? তবু যতোক্ষণ তিনি ঐ ছেলেটাকে পিটিয়ে হাতের সুখ করেছেন ততোক্ষণে এরাও যে যেভাবে পারে মেরেছে তাঁকে। তারপর লাঠি ঘোরানো দেখে মাটিতে পড়ে থাকা ছেলেটাকে তুলে নিয়ে পালিয়েছে। ...বাবা যখন পৌঁছেছেন তখন লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতেই পথ হাঁটছেন নজরুল। বর্ধমান হাউসে যাবেন।.... বাড়িতে এনে বাবা বিছানায় শুইয়ে দিলেন, মা লণ্ঠন কাছে নিয়ে কোথাও জখম হয়েছে কিনা দেখবার জন্য ঝুঁকে পড়েই শিহরিত হলেন। হাতে পায়ে মাথায় পিঠে সর্বত্র আঘাতের চিহ্ন মোটা মোটা হয়ে রক্ত জমে ফুলে উঠেছে। কী করে যে সেই রাতটা আমরা কাটিয়েছিলাম আমরাই জানি। মা ওকে একটা হোমিওপ্যাথি ঔষধ খাইয়ে দিলেন। আমাদের পরিচারিকা পুনার মা....সে চোখ মুছতে মুছতে সমস্ত আহত জায়গা নারকেল তেল দিয়ে ভিজিয়ে দিল। মা বাতাস করতে লাগলেন। আমি আর বাবা প্রায় অচেতনের মতো মেঝেতে বসে রইলাম। রাত ভোর হয়ে গেল। তার মধ্যে নজরুল অবশ্য ঠাট্টা তামাশা করে আমাদের ভারী মন হালকা করার চেষ্টা করেছিলেন, ফলশ্রুতি শুধু অশ্রুর বন্যা।”[১৪]

দুর্ভাগ্যবশত একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবারের চিঠি কেচ্ছা

ছড়িয়েছিল, এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় অরুণ কুমার বসুর লেখায় পাই———— "ঢাকার প্রত্যন্ত এলাকায় বনগাঁ— পাড়ায় রাণু অর্থাৎ প্রতিভা সোমের প্রতি নজরুলের টানটা ছিল প্রধানত কণ্ঠের দিক দিয়ে। দিলীপ কুমার রায়ের পরিচিতা এই ছাত্রীটির সঙ্গে নজরুল নিজে থেকেই আলাপ করতে এসেছিলেন। তারপর তাঁর মধুর কণ্ঠে আকর্ষণে নজরুল তাকে আপন গানের কলস থেকে কেবলই গানের ধারা ঢেলে দিতে চাইলেন। নিজে চলে যেতেন প্রায় প্রতিদিনই রাণুর বাড়ি, গানে মজলিশে রাত হয়ে যেত ফিরতে। পাড়ার সন্দিগ্ধ তরুণরা একবার নজরুলকে ফেরার পথে অন্ধকারে শাসন করারও চেষ্টা করেছিল। দুর্বৃত্তদের এই জাতীয় অতর্কিত হীনতায় নজরুল অপ্রস্তুত হননি, একক দুঃসাহসে তাদের সঙ্গে মোকাবিলাও করেছিলেন। ঘটনাটি চাপা ছিল না। শনিবারের চিঠির ফাল্গুন ১৩৩৪ সংখ্যায় প্রকাশিত নজরুল গানের প্যারডি—

কে উদাসী বনগাঁ বাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে

বাঁশি সোহাগে ভিরমি লাগে বর ভুলে যায় বিয়ের কনে——

সম্ভবত উক্ত ঘটনারই অশালীন ইঙ্গিত।[১৫]

১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য নজরুল যখন যাচ্ছিলেন তখন ট্রেনে সকন্যা প্রতিভা বসু ও বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে নজরুলের দেখা হয়েছিল। তখন নজরুলের অসংলগ্ন কথাবার্তা ও ভাবান্তরে তিনি কষ্ট পান। 'আচমকা রাণুর পিঠে হাত রেখে বললেন, 'শোনো আমি কিছুই ভুলিনি, ভুলে যাইনি, ভোলা সম্ভব নয়...'১৬

নজরুলের জীবনাবসানের পর (১৯৭৬) নজরুল প্রসঙ্গে প্রতিভা বসু লেখেন— 'আসলে সত্যিই আমরা কিছুই ভুলিনি ভুলতে পারি নি, শুধু ভুলে থাকি।[১৭]

এখনকার সময়ে যেভাবে নজরুলের গান হাওয়া হয় তা নিয়ে প্রতিভা বসুর বক্তব্য অনেকটা এইরকম———...নজরুল ইসলামকে ঘিরে আমার সব কথাই ওইটুকু পরিমন্ডলে বাঁধা। ইদানীং ভুলে যাই ভীষণ। অতীত হাতড়ালে অনেক কথা ভিড় করে আসে। ঘটনাগুলির উপর অনেক দিন মাস বছরের প্রলেপ পড়েছে। তবু এখন্যো ভুলতে পারি না সেই সব গান। গান খুব ভালোবাসতাম। গান গাইতেও পারতাম। খুব প্রিয় ছিল আমার নজরুলগীতি। 'সেই যে মন হারালে না পাওয়া যায় মনের রতন....' 'বাগিচায় বলবুলি তুই ফুলশাখাতে....' অপূর্ব সেই গানের পথ ধরেই স্মৃতিতে ভেসে আসেন তিনি। একটা সময় নজরুলগীতিকে ছড়িয়ে দিলাম। তবে নিজের মত করে গেয়ে, এখন যা সব হচ্ছে কথা বদলে তেমন নয়। ওঁর নিজের শিখিয়ে দেওয়া সুরে গান গাইতাম। ভীষণ ভালো লাগত। খুব চেষ্টা করতাম ওর গানের কথাগুলিকে জীবন্ত করে তুলতে।"[১৮]

রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ে প্রতিভা বসুর নিজের ভাবনাচিন্তা ও স্মৃতিচারণায় সমৃদ্ধ একটি লেখা ১৯৪১ সালের ১৫ ই মে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল 'রবীন্দ্রনাথের গান' এই শিরোনামে। তাতে তিনি লিখেছেন "খুব ছেলেবেলায় বাবার মুখে আরো অনেক গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেন না, শুকনো ধূলো যত' আর 'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে' গান দুখানি প্রায়ই শুনতে পেতাম। সে গানে বাবা টান দিলেই আমার মন যেন কেমন করে উঠতো। এমন অদ্ভূত একটা মন কেমন করা ভালোলাগায় আমি অভিভূত হয়ে যেতাম.... সে গান দু'খানা আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। খেলতে খেলতে, বেড়াতে বেড়াতে, খেতে খেতে, সমস্ত কাজের মধ্যে--- --- ---এখনো স্পষ্ট মনে আছে———ঐ গান আমার সঙ্গে গুনগুনিয়ে ফিরতো। একটু বড় হবার পরে আমার সঙ্গীত শিক্ষার আদিগুরু চারুচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অদ্ভূত সুললিত কণ্ঠে আমি একদিন 'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী' গান খানি চোখ মুদ্রিত করে শুনতে শুনতে আকুল হয়ে কেঁদে উঠেছিলাম। অবোধ শিশুচিত্ত---সে জানে না এ কার গান, বিচার বিতর্কের অতীত সে মন---তবে কোন অনুভূতিতে তার হৃদয়, তার মগ্নচেতনা এমন বিচিত্রভাবে সাড়া দিয়ে উঠেছিল? এই যে অবোধ মনে সঙ্গে বিরাট বুদ্ধির একটা সহজ যে যোগাযোগ এটা স্থাপন করা অলৌকিক প্রতিভাসাপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথের গান শুনতে শুনতে তাঁর কাব্য ও সুরের অপূর্ব সমাবেশ আমার চিত্ত আপনা থেকে আবিষ্ট হয়ে আসে-- আমরা যেন কোন এক ব্যাপক মুক্তিলোকে বিচরণ করতে থাকি।"[১৯] ----আবার 'কবিতা' পত্রিকার ১৩৫০--সালের আষাঢ় সংখ্যায় বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত শান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' শীর্ষক গ্রন্থখানিকে নিয়ে প্রতিভা বসুর একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে তিনি লিখেছেন যে কীর্ত্তন ভাটিয়ালি, বাউল বা রামপ্রসাদী এ জাতীয় গানের পরবর্তী সময়ে বাংলা গানের জগতে নতুন সংযোজনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও নজরুল ইসলামের নাম করা গেলেও বৈচিত্র্যে ও অজস্রতায় অভিনব রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের জুড়ি কেউ নেই। আলোচক প্রতিভা বসু মনে করেন "বাংলাদেশে সঙ্গীত রচয়িতা রূপে রবীন্দ্রনাথের মতো সঙ্গীতকারের আবির্ভাব ক্ষুধিতের মুখে অন্নের মত। তিনি যেন আমাদের মর্ম্মস্থানে এসে আঘাত দিলেন। এত প্রাচুর্য যেন আমরা বিশ্বাস করতে পারলুম না। বোধ হয় সেই কারণেই প্রথম প্রথম তাঁর গান আমরা ঠিক গ্রহণ করে উঠতে পারিনি।"[২০]

নজরুল ইসলামের পর রবীন্দ্রনাথের কাছেও রাণুর সঙ্গীত শেখার সৌভাগ্য হয়েছিল সেকথা আগেও বলা হয়েছে। এখানেও সেই সংযোগকারী মানুষটি মন্টু ওরফে দিলীপ রায়। দিলীপ রায়ের চিঠিতেই রবীন্দ্রনাথ রাণুর সম্পর্কে জেনেছেন। অপরদিকে দার্জিলিং-এ অবস্থানরত রাণুকেও দিলীপ কুমার রায় চিঠি লিখেছেন এই মর্মে যে--'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুমি দেখা কোরো, তিনি দার্জিলিং এ আছেন।'[২১] রাণুর বয়ানে রবীন্দ্রনাথ 'পৃথিবীর প্রধান পুরুষ' কিন্তু কিশোরী রাণু নিজে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করবেন সেই সাহস ও শক্তিটুকু সঞ্চয় করতে পারছিলেন না অথচ তাঁর মনপ্রাণ এই মানুষটির সন্দর্শনে যাবার জন্য উদগ্রীব হয়েছিল। তাই তিনি লিখেছেন, 'এমন শক্তি আমি মনের মধ্যে পেলাম না যাতে করে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারি।'[২২]

মনের এমন অবস্থায় মেঘ না চাইতেই জলের মতো দিলীপ রায়ের চিঠি পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ নিজেই একদিন রাণুকে ডেকে পাঠান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে এই আশাতীত নিমন্ত্রণ পেয়ে

রাণু ওরফে প্রতিভা বসু তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন এইভাবে---"একতলার বসার ঘরে সেলাই নিয়ে বসেছিলাম। দরজায় টুক্ টুক্ শব্দ হলো। খুলে দেখি অপরিচিত একটি লোক আমার হাতে একটা মস্ত দিশি কাগজের খাম ধরিয়ে দিয়ে নমস্কার জানিয়ে চলে গেল। খামের উপর আমার নাম লেখা। খামের কোণে 'রঠ' মনোগ্রাম। আমি এই 'রঠ' লেখা মনোগ্রামের সঙ্গে তখনও পরিচিত ছিলাম না। খাম খুলে দেখলাম প্রতিমা দেবীর সই করা একটি চিঠি।' লিখেছেন, 'আপনি যদি কাল চারটের সময় গ্লে-ন এডেনে এসে আমাদের সঙ্গে চা পান করেন তাহলে বাবামশাই খুব সুখী হবেন।' চিঠিটা পড়ে আমি এমন হতভম্ব হয়ে গেলাম যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত এই চিঠির মর্মগ্রহণ করতে পারলাম না। আমার নিজের চোখকে আমার বিশ্বাস হচ্ছিলো না। বিশ্বাস হবার কোনো কারণও ছিল না। কোথায় কোন্ ঢাকা শহরের একটি মেয়ে আমি, কী যোগ্যতায় এত বড় সম্মানের অধিকারী হতে পারি? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ আমাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছেন শুধু তাই নয় আমি গেলে বাবামশাই খুশী হবেন, এর চেয়ে অবিশাস্য ঘটনা আর কী হতে পারে আমার জীবনে? উত্তেজনায় আমি থরথর করে কাঁপছিলাম।.......পরের দিন ধুকপুক বক্ষে কাকুর সঙ্গে ঠিক সময়ে গ্লে-ন এডেনে গিয়ে হাজির হলাম। ঢুকতে সাহস হচ্ছিল না। বাইরের ঘরে একটি যুবক দাঁড়িয়েছিল, তাকে চিঠিটা দেখাতেই সে আমাদের সসম্মানে নিয়ে গেল ভিতরে। গিয়েই দেখতে পেলাম মাঝখানে একটি গদি মোড়া চৌকিতে বসে আছেন তিনি। অনেকক্ষণ মুখে বাক্য সরলো না, সম্বিৎ ফিরতে তাড়াতাড়ি গিয়ে প্রণাম করলাম। তিনি সহাস্যে তাকিয়ে বললেন, 'ও তাহলে তুমিই মন্টুর ছাত্রী?"[২৩] দার্জিলিং এ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হওয়ার পর প্রতিভা বসুর উপলব্ধি--"যতদিন সমুদ্র দেখিনি ততদিন যত বড় করে ভাবা সম্ভব ততখানিই ভেবেছি। কিন্তু সত্যিকারের সমুদ্র যখন দেখলাম তখন বুঝলাম কল্পনার পরিধি আমার বড়ই ছোট। রবীন্দ্রনাথকে দেখেও আমার সেই কথাই মনে হয়েছিল।"[২৪]

রবীন্দ্রনাথের কাছেও রবীন্দ্রসংগীত শিখলেন রাণু, জানালার ধারে বসে পাহাড়ে সর্যোদয় দেখতে দেখতে রবীন্দ্রনাথের কাঁপা কাঁপা গলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে রাণু সোম গাইতেন, 'আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত নাথ হে ফিরে এসো, এসো হে।'[২৫] এই গান তখন রবীন্দ্রনাথের খুব প্রিয় ছিল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেও গাইতেন। আবার রাণুকে একা গাইতে বলে চোখ বুঁজে শুনতেন। এ কথা আমরা 'জীবনের জলছবি' থেকে জানতে পারি। সেই গ্রীষ্মের ছুটিতেই দার্জিলিং এ জিমখানা ক্লাবে একটা পারফরমেন্স হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথামতো রাণু তাতে অংশগ্রহণও করেছিলেন। নজরুলের মতো রবীন্দ্রনাথও রাণুকে বলেছিলেন পরের বার যেন তিনি তাঁর গান রেকর্ড করেন; হিজ মাস্টার্সে নয় হিন্দুস্থানে।

ছোটবেলা থেকে হারমোনিয়াম দিয়ে গান গাইতে গাইতে প্রতিভা বসু হারমোনিয়াম ছাড়া খালি গলায় গাইতে অভ্যস্ত ছিলেন না। দার্জিলিং এ রবীন্দ্রনাথ যখন এ কথা জানলেন তখন বললেন---"পাখিরা যে গান গায় তাদের কি কোনো বাজনা লাগে?' রবীন্দ্রনাথই আবার বলেছিলেন 'এবার আমার গান আমি তোমাকে শুধু গলায় গাইতে শেখাব। যদি কিছু যন্ত্র চাও তো এস্রাজ। তা ব্যতীত কিন্তু কিছু নয়।' তাই হলো, রবীন্দ্রনাথের গান আমি যন্ত্র ছাড়াই গাইতে শিখেছিলাম। উনি বললেন ভালো গান গাইতে গেলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতটাই আগে শিখে নিতে হয়, তোমার গলাটা তৈরী। গানের কাজ গুলো তুমি বুঝতে পেরেছো।"[২৬]

গায়কীর ও কণ্ঠস্বরের এই প্রশংসা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও করেছিলেন রাণুকে। পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কীর বিষয়ে প্রতিভা বসু আক্ষেপ করে বলেছিলেন "এখন যখন টেলিভিশনে রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে কনসার্ট বেজে উঠে, আর টক্‌টক্ করে তবলার বোল গান ছাপিয়ে উঠে গানের কথাগুলো ডুবিয়ে দেয় তখন কষ্টের আর অবধি থাকে না। ধরা যাক, গানটা হলো 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চিরদিন কেন পাই না/কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে, তোমাকে দেখিতে দেয় না।'

লাইন দুটো ভাবুন। কী আশ্চর্য তার ভাষা, কী আশ্চর্য সহজ সরল কথায় কী প্রচন্ড তার আর্তি, গায়ক এখানে থেমে বিরতি দিলেন। আমাদের ভাবনাকে তার গভীরে ডুব দেবার জন্য নয়, ছত্রিশটা বাজনাকে একসঙ্গে বেজে উঠার জন্য। 'কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে, তোমাকে দেখিতে দেয় না।' মেঘ যতই আসুক আস্তে সে সরেও যায়। কনসার্ট আসে সোজা ঢাল তলোয়ার নিয়ে। একবারে যুদ্ধং দেহি ভাব। যে গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একটা হারমোনিয়াম বাজাতে দিতেও রাজি ছিলেন না এখন তার কী দশা। কনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিন্তু হারমোনিয়াম লাগে না। নীলিমা সেনেরও লাগে না। এ দু'টি নাম সবাই জানেন বলেই লিখলাম। নচেৎ শান্তিনিকেতনের সব মেয়েই তখন খালি গলায় গান করতো। এ গান তাদের উঠতে বসতে শয়নে স্বপনে। এ গান আমাদের সকলেরই যে কোনো সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায়, আশা-নিরাশায়, ধর্মে-কর্মে, সবকিছুতেই একটি মাত্র যন্ত্রের উপর নির্ভর, যার নাম কণ্ঠস্বর।"[২৭]

বিবাহ পরবর্তী সময়ে তিনি মন থেকে তাগিদ না পেয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন যদিও গানকে কেন্দ্র করেই সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় শেষ পর্যন্ত পরিণয়ে পরিণতি লাভ করেছিল এবং গানের মধ্য দিয়েই তিনি বহুবিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের সান্নিধ্যে এসেছিলেন যাঁদের সাহচর্য তাঁর জীবনের অমূল্য পাওনা। ছোট শহরে থাকার কারণে রাণু ও বুদ্ধদেব বসু একে অপরকে চিনতেন কিন্তু সেরকমভাবে আলাপ ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথ বসু বাড়িতে দিলীপ রায়ের ঘটকালিতেই রাণু-বুদ্ধদেব একে অপরের সঙ্গে সামনাসামনি পরিচিত হন। সেই আলাপ ও গান শোনার পর থেকে রাণুর প্রতি বুদ্ধদেবের প্রথম অনুরাগ ঘটে। যখন তিনি পাকাপাকিভাবে কলকাতায় চলে আসেন, সেই সময় রাণু প্রতি বছরেই দু-দুবার রেকর্ডিং এর জন্য কলকাতা আসতেন। কলকাতায় রাণুর সঙ্গে কিছুদিন দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার পর রাণু বিষয়ে বুদ্ধদেব প্রথম নিজের মধ্যে যে একটা অন্য রকমের পরিবর্তন আবিষ্কার করেছিলেন তা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেনঃ

".....তার প্রকৃতিদত্ত সুকণ্ঠ ও সুরজ্ঞান সত্ত্বেও তার আসল টান সাহিত্যের দিকে.... আমি অনুভব করি এক জায়মান অন্য কিছুকে, যেন আমার মনের মধ্যে এক হাওয়া উঠলো--সুখের কিন্তু সম্পূর্ণ সুখের নয়-- কত জোরালো সেই বাতাস তা কষ্টকর ভাবে ধরা

পড়লো সেদিন, যেদিন সকালে উঠে আমি প্রথম কথা ভাবলাম, 'এতক্ষণে রাণু স্টীমারে। 'আলোর দিকে তাকিয়ে দিনটাকে শূন্য মনে হলো।....বিচ্ছেদ, অভাববোধ--তার তাড়নায় আমার নতুন করে কবিতা লেখা শুরু হলো, অনেক দিন পরে আবার। 'বন্দীর বন্দনা', 'কঙ্কাবতী' থেকে দূরে ভিন্ন সুরে-লিখি দু-তিনটি করে গদ্য কবিতা প্রতিদিন। ক্ষুদ্রকার ও সরল ও মন্ময়---যা নিয়ে মতো। কোনো পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাই না-- মনে হয় যেন বড়ো বেশি ব্যক্তিগত---আমি চাই না এই মুহূর্তে সেগুলি অন্য কারো চোখে পড়ে। একদিকে কবিতায় এই নিভৃতভাষণ, অন্যদিকে পত্রচালিত দ্বিরালাপ-- এরই মধ্য দিয়ে অব্যক্ত হলো সুপরিস্ফুট---আমার নিজের কাছে এবং অন্যজনের কাছেও, তার মনও আর লুকানো রইলনা-- আমরা পূর্বরাগের সবগুলো ধাপ পেরিয়ে এলাম।---"[২৮]

নানা সমস্যা কাটিয়ে ১৯৩৪ সালের শ্রাবণ মাসে বুদ্ধদেব বসু ও রাণু সোম বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, পূর্বরাগের নিভৃতভাষণের যে কথা বলা হয়েছে সে সব কবিতা তাঁদের বিয়ের পরে ১৯৪০ এ 'নতুন পাতা' নামক কাব্য গ্রন্থে সংকলিত হয়--এই বইটি বুদ্ধদেবের পূর্বরাগ ও প্রণয়ের দলিল। বইটি তিনি উৎসর্গ করেছেন প্রতিভা বসুকে।

বিয়ের পর কলকাতায় এসে প্রতিভা বসু সংসারধর্মপালনে মনোনিবেশ করেন। সেই থেকে আপনভোলা সাহিত্যপাগল স্বামী, বৃদ্ধা দিদিশাশুড়ী ও ক্রমশ তিন পুত্র কন্যার মা হয়ে সকলের যাবতীয় দায়দায়িত্ব নিয়ে চলতে থাকে প্রতিভা বসু সংসার তরণী। অর্থনৈতিকভাবে পূর্ণস্বাচ্ছন্দ্য না থাকলেও বুদ্ধদেব--প্রতিভার সংসারযাত্রা ছিল বর্ণময়, নানা শাখায় সৃজনশীল সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি কখনও কবিতা ও প্রকাশনা সংস্থার কাজ এসব ছাড়াও বুদ্ধদেবের কলকাতার বাইরে সাহিত্যসভার নিমন্ত্রণ, আবার কখনও একেবারে দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক সাহিত্যিক কনফারেন্স। এত ধরনের সাহিত্যিক ও সাংসারিক কাজের ভিড়ে রাণুর সঙ্গীতজীবন আর ফুলেফলে বেড়ে উঠতে পারল না।

সঙ্গীত জগৎকে পাশ কাটিয়ে রাণুর সাহিত্যে অনুপ্রবেশের ঘটনাটিকে বুদ্ধদেব বসু এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন----

"গ্রামোফোন কোম্পানীর উৎসাহ কমে যায় নি, কিন্তু বিয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যে রাণুর গানের চর্চা শুকিয়ে গেলো। সে তোড়জোড় বেঁধে শুরু করেছিলো কয়েকবার, কিন্তু ধারাবাহিকভাবে চালাতে পারে নি ঃ নিয়মিত ওস্তাদের বেতন জোগাতে গেলে বাজারখরচে টান পড়ে আমাদের, সাহিত্যিক---অধ্যুষিত হাস্যরোলমুখর ছোট ফ্ল্যাটে খেয়ালের তান পাখা মেলতে পারে না। উপরন্তু অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো আমাদের শিশুকন্যাটি; রাণু হার্মোনিয়াম খুলে গানে টান দিলেই সে ভয় পেয়ে তাঁর মায়ের মুখ চেপে ধরে, জীবনের প্রবলতর ধ্বনির কাছে সুরশিল্পকে পিছু হটতে হয়। হয়ত এও এক বাঁধা ছিলো যে আমি রাগসঙ্গীতে বধির এবং রাণুর নিজেও নেই সেই জেদ এবং উচ্চাশা, যার উশকোনি বিনা প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা একলা বেশীদূর এগোতে পারে না।[২৯]

তাই দেখা যায় বিয়ের পর পদবী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন রাণুর পারিপার্শ্বিক জগতেরও আমুল বদল হয়, বদল হয় তাঁর ভাবনাচিন্তার ক্ষেত্রও। তাঁর জীবন স্রোতস্বিনীর ধারা এইখানে এসে আশ্চর্যজনক ও ঐতিহাসিক মোড় নেয় এবং গতিপথ পরিবর্তন করে। জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী রাণু সোম জীবনের এই বাঁকে এসে সঙ্গীতক্ষেত্রকে পুরোপুরি পাশ কাটিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করেন এবং ক্রমশ প্রতিভা বসু নামে একজন জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। যদিও বুদ্ধদেব বসুর মতো ডাকসাইটে সাহিত্যিককে বিয়ে করে তাঁরই সমান্তরালে সাহিত্যব্রতী হতে চাননি প্রতিভা, ইচ্ছে থাকলেও সে থেকে মুখ ফিরিয়ে বরং সংসার সাজাতে গোছাতেই নিমগ্ন ছিলেন,সঙ্গীতকে চিরতরে ভুললেন কারণ সংসারসমুদ্রে তরণী যখন লটবহরে বোঝাই হয়ে টালমাটাল অবস্থায় তখন সাংসারিক দাবী ও দায়িত্বকে মাথায় রেখে ইঞ্জিনচালকের স্টিয়ারিং ধরাটাই অন্যতম কাজ তখন মূল দায়িত্ব এড়িয়ে সঙ্গীতকে নিয়ে থাকার অবকাশ তিনি পান নি। তাছাড়া সঙ্গীত এমন একটা বিদ্যা যেটার সবসময়েই পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন, বরাবর অনুশীলন এবং ক্রমাগত তালিম ও সঙ্গতের প্রয়োজন। এসব ছাড়াও সাহিত্যের প্রতি বা সাহিত্যের আড্ডার প্রতিও প্রতিভা বসুর আকর্ষণ ছিল অকৃত্রিম ও হয়ত কিছুটা অদম্য তাই সঙ্গীতকে ভোলা ছাড়া তাঁর কোনো উপায় ছিল না যদিও সাহিত্যে তাঁর রুচি, মেধা, মনন, পারদর্শিতা পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভা না থাকলে জোর করে কাউকে অন্তত সাহিত্যিক বানানো যায় না। বিয়ের বেশ কিছুদিন পর বলা যায় ধাক্কা দিয়েই সাহিত্যের ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে আর সেই ধাক্কাটা এসেছিল বসুমতী সাহিত্যমন্দিরের সুবোধ মজুমদারের কাছ থেকে। তিনি বুদ্ধদেব বসুকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব—প্রতিভা মিলে যদি একটা রোমান্টিক উপন্যাস লিখে দেন তাহলে তারা সেটা ছাপাতে আগ্রহী। সেই প্রস্তাবের পর বুদ্ধদেব বসুর অনুরোধে প্রতিভা বসু সেই যে কলম ধরেন তার পরবর্তী অর্ধশতকেরও বেশী সময় তিনি লিখে গেছেন। অন্তত পঞ্চাশটির বেশী উপন্যাস, শতাধিক প্রাণস্পর্শী গল্প, আত্মজীবনী, অবিস্মরণীয় কিছু স্মৃতিকথা, ভ্রমণ কাহিনী, কিছু কবিতা এবং জীবনের শেষ সময়ে লেখা দুঃসাহসী মননশীল গদ্য গ্রন্থ 'মহাভারতের মহারণ্যে' প্রভৃতি সাহিত্যসম্ভার বাংলাসাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর বহু গল্প শ্রুতি নাটকে রূপান্তরিত হয়েছে এবং প্রায় ১৫টির মতো গল্প-উপন্যাস থেকে বাংলা ও হিন্দী সিনেমা হয়েছে।

'একান্তর' সাময়িক পত্রের সম্পাদকীয়তে অরূপ আচার্য লিখেছেনঃ".....প্রিয় সাহিত্যিক প্রতিভা বসু যাঁর লেখার গুণগ্রাহী আমি।....বুদ্ধদেব বসুর তো যুগন্ধর প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গত করে গেছেন। অথচ স্ব মহিমায় উজ্জ্বল থেকেছেন।...পান্ডিত্যের বিভীষিকা থেকে বেরিয়ে মুক্ত বাতাস নিয়েছেন বুক ভরে। জীবনের শেষে উপহার দিয়েছেন এমন একটি গ্রন্থ যার কাছে মহারথী লেখকও মাথা নত করতে বাধ্য হবেন। মনে রাখতে হবে লেখা দিয়ে জীবনকে লালন করেছেন তিনি। ছেলেমেয়েদের কৃতী করে গড়ে তোলার ফাঁকে এমন সাহিত্যের মিনার বানানো সহজ নয়। তিনি মহিয়সী নারী যতটা, ততটাই স্রষ্টা। 'মহাভারতের মহারণ্যে'কে পুরস্কার না দেওয়া আমাদের এক অপূর্ব অজ্ঞতা।"[৩০]

তবুও সঙ্গীত ছিল রাণুর জীবনে বিশেষ এক আলোকশিখার

মতো, সঙ্গীতের স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রভার বিচ্ছুরণেই তাঁর জীবন আলোকিত হয়েছিলো নানাভাবে। এর জন্য একটা সময় তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে অনেক কষ্ট অনেক যাতনা ও অনেক লড়াই করতে হয়েছিল। তখনকার সময়ে কোন ভদ্র ঘরের মেয়ে তবলার বাজনার গলায় গিটকিরি দিয়ে গান গাইছে এরকম ব্যাপারকে প্রতিবেশীরা ভাল নজরে দেখতো না। ভালো ওস্তাদের কাছে গান শেখানোর জন্য প্রতিভার পিতাকে দু-দুবার বাড়ি বদলাতে হয়েছিল। তবলা বাজিয়ে গান গাওয়ার জন্য সে সময় তাঁদের বাড়িতে দু-একবার ঢিলও পড়েছিল। তবে এটুকু বলা যায় যে সাহিত্যিক প্রতিভা বসুর জনপ্রিয়তার সৌরালোকে সঙ্গীত শিল্পীর স্নিগ্ধ চন্দ্রাতপকে ছাপিয়ে গেল, আমরাও প্রতিভার সঙ্গীতপ্রতিভাকে বিস্মৃত হলাম অনেকটাই।

সময় বড় বলবান। একসময় যারা সাহিত্য-সংস্কৃতি বা অন্যান্য যে কোন ক্ষেত্রেই দেশ কাঁপিয়ে বেড়ান তাদের অনেকের নামই কালপ্রবাহে হারিয়ে যায়। সমুদ্রের স্রোতের মত কালের ঢেউ ক্রমাগত একের পর এক আসতে থাকে। মানুষেরা হারিয়ে যান বিস্মৃতির অতলে। এমনই একটি নাম হলেন আত্মপ্রচারে কুণ্ঠিত, স্তাবকতায় অনীহ প্রতিভা বসু ওরফে রাণু সোম (১৯১৫-২০০৬)। শিল্পসাহিত্যের জগতে তাঁর যথেষ্ট অবদান থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে তিনি আর সেইরকমভাবে আলোচিত হন না। তাঁর অবদানকে মনে রেখে বিস্মৃতির গহ্বর থেকে তথ্যসমূহকে আলোচনার আলোকে নিয়ে আসার জন্য তাঁর সম্পর্কে গবেষণার প্রয়োজন। শতবর্ষের প্রাকলগ্নে সঙ্গীতশিল্পী প্রতিভা বসুকে বর্তমান প্রবন্ধকারের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

উল্লেখপঞ্জি ঃ

১) 'জীবনের ক্যানভাসে শিল্পীর প্রতিভায়' ঃ সেরিনা জাহান, একান্তর প্রতিভা বসু সংখ্যা, সম্পাদক ঃ অরূপ আচার্য, পৃ-২০৭

২) জীবনের জলছবি, ষষ্ঠ মুদ্রণ—পৃ-১৪

৩) তদেব—পৃ-১৫

৪) তদেব—পৃ-৩০

৫) তদেব—পৃ-৩৯-৪০

৬) তদেব—পৃ-৪৪

৭) তদেব—পৃ-৪৫

৮) 'নজরুল ইসলাম' ঃ ব্যক্তিত্ব বহুবর্ণে, পৃ-৫৪

৯) জীবনের জলছবি, ষষ্ঠ মুদ্রণ—পৃ-৪৫

১০) তদেব—পৃ-৪৪-৪৫

১১) তদেব—পৃ-৪৬-৪৭

১২) নজরুল ইসলাম ঃ প্রতিভা বসু, দেশ প্রত্রিক, ২৪ মে ১৯৮০

১৩) জীবনের জলছবি, ষষ্ঠ মুদ্রণ—পৃ-৫২-৫৩

১৪) নজরুল জীবনী, অরুণ কুমার বসু—পৃ-২৭০-২৭১

১৫) জীবনের জলছবি, ষষ্ঠ মুদ্রণ—পৃ-১৩৯

১৬) তদেব—পৃ-১৩৯

১৭) 'যে দিন ভেসে গেছে' প্রতিভা বসু, একান্তর —পৃ-১৬৬

১৮) রবীন্দ্রনাথের গানঃ ব্যক্তিত্ব বহুবর্ণে—পৃ-৯

১৯) রবীন্দ্রসঙ্গীত, শান্তিদেব ঘোষ। বিশ্বভারতী, প্রতিভা বসু--কবিতা পত্রিকা আষাঢ় সংখ্যা—পৃ-১৩৫০

২০) রবীন্দ্রনাথের গান ঃ ব্যক্তিত্ব বহুবর্ণে —পৃ-৯

২১) রবীন্দ্রনাথের গান ঃ ব্যক্তিত্ব বহুবর্ণে—পৃ-৯-১০

২২) জীবনের জলছবি, ষষ্ঠ মুদ্রণ— পৃ-৯৪

২৩) রবীন্দ্রনাথের গান ঃ ব্যক্তিত্ব বহুবর্ণে —পৃ-১০

২৪) জীবনের জলছবি, ষষ্ঠ মুদ্রণ—পৃ-৯৪

২৫) রবীন্দ্রনাথের গান ঃ ব্যক্তিত্ব বহুবর্ণে —পৃ-১১৬

২৬) দেশ, পাক্ষিক, ২৬ জুন ও ১০ জুলাই, ১৯৯৯

২৭) 'যেদিন ভেসে গেছে------', প্রতিভা বসু, একান্তর, প্রতিভা বসু সংখ্যা, সম্পাদনা ঃ অরূপ আচার্য—পৃ-১৬৬

২৮) 'আমাদের কবিতা ভবন' বুদ্ধদেব বসু। প্রথম সংখ্যা—পৃ-২২-২৩

২৯) 'একান্তর' প্রতিভা বসু সংখ্যা, সম্পাদনা ঃ অরূপ আচার্য—পৃ- ৫।

রবীন্দ্র কাব্যে নারী

■ ড. গীতা দেবনাথ

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপন প্রতিভার অনির্বাণ জ্যোতিতে দীপ্ত ও দ্যুতিমান করলেও রবীন্দ্রনাথ সর্বোপরি কবি। তাঁর গানে, কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, অজস্র চিঠিপত্রে নারীকে তিনি এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তারূপে উদ্ভাসিত করেছেন।

কবি তাঁর কাব্যজীবনের উন্মেষপর্বে যে সব কবিতা লিখেছেন সেগুলিতে নর-নারী প্রণয় বিরহ ইত্যাদি প্রাধান্য পেয়েছে। যৌবন বেদনা-রসে উজ্জ্বল জীবনে অকারণ বিরহ বেদনা, আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। তখন কবি ছিলেন—'বিরহ তপোবনে আনমনে উদাসী। কিন্তু 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতায় কবি নারীর 'জননীস্বরূপ' এবং তার অসীম শক্তিতে বিস্ময়ে অভিভূত। সমুদ্রবক্ষে নিমজ্জিত তরী, জননী শিশুসন্তানকে আকড়ে ধরে রেখেছেন নিজের কোলে। সন্তানকে মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা করবেন। অসীম স্নেহ তার! অপার তার শক্তি!

"আকাশেতে পারাবারে দাঁড়ায়েছে এক ধারে।
এক ধারে নারী—
দুর্বল শিশুটি তাঁর কে লইবে কাড়ি"।

নারীর বিভিন্ন রূপ। কখনও সে কন্যা, কখনও প্রিয়া, কখনও 'বধূ' কখনও জননী। আবার কখনও সমস্ত সত্তাকে ছাড়িয়ে এক মানবী হিসেবে স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা হিসেবে নিজেকে উপলব্ধি করতে চায়। নারীর এই সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের পথে বহু বাধা। রবীন্দ্রসাহিত্যে ছোটগল্পে, উপন্যাসে, নারী সত্তার বিবর্তনের বহুমাত্রিক রূপ আছে।

'মানসী' কাব্যগ্রন্থের 'নারীর উক্তি' কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথ নারীর হৃদয়ের গহনে প্রবেশ করে তার মর্মের কথাকে ভাষারূপ দিয়েছেন।

—"আছি যেন সোনার খাঁচায়
একখানি পোষমানা প্রাণ,
এও কি বুঝাতে হয়—প্রেম যদি নাহি রয়
হাসিয়ে সোহাগ করা শুধু অপমান।"

'এ কাব্যের 'বধূ' কবিতায় নারীর হৃদয়ের কথাকে রবীন্দ্রনাথ অতি মর্মস্পর্শী করে কবিতা রচনা করেছেন। একটি মেয়ে বিয়ের পর নিজের বাবা-মা-ভাই-বোন প্রতিবেশী বন্ধু সবাইকে ছেড়ে নতুন পরিবেশে স্বামীর ঘরে আসে। সেখানে যদি ভালোবাসা না থাকে মেয়েটি অসহায় বোধ করে। এ অবস্থায় মেয়েটির মনে হয়—"ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি। পরখ করে সবে, করে না স্নেহ।" রবীন্দ্রনাথ মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেছেন অনেক না বলা কথা।

"সবার মাঝে ফিরি একেলা
কেমন করে কাটে সারাটা বেলা।
ইঁটের পরে ইঁট মাঝে মানুষ কীট—
নাই কো ভালোবাসা, নাই কো মেলা।"

'সোনার তরী' কাব্যে 'মানসসুন্দরী' কবিতায় নারীকে মাধুর্য আর কল্যাণের প্রতিমূর্তিরূপে তিনি উপলব্ধি করেছেন।

"জীবনের প্রতিদিন, তোমার আলোক পাবে বিচ্ছেদবিহীন
জীবনের প্রতিরাত্রি হবে সুমধুর মাধুর্যে তোমার।
বাজিবে তোমার সুর সর্ব দেহমনে।
প্রতি দুখে পড়িবে তোমার অশ্রুজলে;
প্রতি কাজে রবে তব শুভ হস্ত দুটি,
গৃহমাঝে জাগায় রাখিবে সদা সুমঙ্গল জ্যোতি।"

'বিদায় অভিশাপ' কাব্যনাট্যে 'দেবযানী' ও 'কচ' চরিত্রদুটিকে আধুনিক জীবনবোধের আলোকে নির্মাণ করেছেন। দেবযানী 'কচ' কে বলে—"রমনীর মন/সহস্রবর্ষেরই সখা, সাধনার ধন। কচ দেবযানীকে জানায় বিদ্যালাভই তার উদ্দেশ্য। সে কাজে সফল হয়েছে, দেবযানীর প্রতি সে কৃতজ্ঞ। দেবযানী তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিদ্ধ করে 'কচ'-কে—

"বুঝেছি এখন,
আমারে করিয়া বশ পিতার হৃদয়ে চেয়েছিল পশিবারে,
কৃতকার্য হয়ে আজ যাবে মোরে কিছু দিয়ে কৃতজ্ঞতা।
তোমা-পরে এই মোর অভিশাপ।
যে বিদ্যার তরে মোরে করো অবহেলা, সে বিদ্যা
তোমার সম্পূর্ণ হবে না বশ।"

দেবযানী অধিকার সচেতন নারী। 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যেও 'চিত্রাঙ্গদা' অর্জুনকে বলেছে—'দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা মানবী।' সুখে দুখে, সম্পদে বিপদে অর্জুনের পাশাপাশি মর্যাদার সঙ্গে থাকতে চেয়েছে। বিশ শতকের বাঙালী পাঠক-পাঠিকা এই আত্মসচেতন আত্মমর্যাদাবোধে জাগ্রত নারীর পরিচয়কে গ্রহণ করেছে।

'চৈতালী' কাব্যগ্রন্থের 'দিদি' কবিতাটি কবির সূক্ষ্ম সংবেদনশীল পর্যবেক্ষণের ফসল। পশ্চিমী মজুরে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে মাটি কাটে। ঘরে থাকে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। নাবালিকা মেয়েরা মার অনুপস্থিতির সময় সংসারের সব কাজ সামলায়—ছোট ভাইবোনদের দেখা-শোনা করে। এদের তুচ্ছ জীবন যাপন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। এদের নিয়েই লিখেছেন

'দিদি' নামে কবিতাটি।

'নদীতীরে মাটি কাটে সাজাইতে পাঁজা পশ্চিমী মজুর।
তাহাদেরই ছোটো মেয়ে ঘাটে করে আনাগোনা
কত ঘষামাজা ঘটি বাটি থালা লয়ে,
ভরা ঘট লয়ে মানে,
বাম কক্ষে থালি, যায় বালা জন হাতে ধরি শিশুর।
জননীর প্রতিনিধি কর্মভারে অবনত-অতি ছোট দিদি।'

'পলাতকা' কাব্য গ্রন্থের 'মুক্তি' কবিতায় সংসারের চার দেয়ালে আবদ্ধ নারী বলে—

'এ সংসারে এসেছিলেম ন-বছরের মেয়ে,
তারপরে এই পরিবারের দীর্ঘ গলি বেয়ে
দশের ইচ্ছা বোঝাই করা এই জীবনটা টেনে টেনে শেষে
পৌঁছিনু আজ পথের প্রান্তে এসে;
সুখের দুখের কথা! একটু খানি ভাবব এমন সময় ছিল কোথা?'

নারীর জীবন সংসারের এক চাকায় সর্বদায় ঘুরছে। এর থেকে সে মুক্তি পায়না। তাই অসুখ এসে যখন বাসা বাঁধল তখন 'মুক্তি' কবিতায় 'নারী' বলে 'ওষুধ' কেন? প্রাত্যহিকতার আবরণে ঢাকা পড়ে যায় নারীর নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা। তাই জীবনের অনেকটা সময় পেরিয়ে মুক্তির বাসনায় আন্দোলিত নারী বলে—

'আমি নারী, আমি মহিয়সী
আমার সুরে সুর বেধেছে জ্যোৎস্নাবীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যা তারা ওঠা,
মিথ্যা হত কাননে ফুল-ফোটা।'

'পলাতকা' কাব্যগ্রন্থের 'ফাঁকি' কবিতায় গদ্যছন্দে 'বিনু' নামে তেইশ বছর বয়সের এক নারীর কথা বলেছেন। সেও অসুখে পড়েছে। নানারকম চিকিৎসার পর ডাক্তার বললে 'হাওয়া বদল করো।' এই সুযোগ বিনু এবার চাপল প্রথম রেলের গাড়ি। বিয়ের পরে ছাড়ল প্রথম শ্বশুর বাড়ি।'

'পথের বাঁশি পায়ে পায়ে তারে যে আজ করেছে চঞ্চলা—
আনন্দে তাই এক হল তার পৌঁছল আর চলা।'

'নিষ্কৃতি' কবিতায় 'মঞ্জুলিকা' কেন্দ্রীয় নারী। বিশশতকের বাংলা দেশেও আপাত আধুনিকতার অন্তরালে পারিবারিক সম্মান রক্ষার নামে নারীর প্রতি যে অবহেলা, নিষ্ঠুরতা ছিল তার কিছুটা পরিচয় এ কবিতায় আছে। বিধবা মঞ্জুলিকা প্রেমিক পুলিনের হাত ধরে ঘর ছেড়েছে। নিষ্কৃতি পেয়েছে নির্দয় পিতার মিথ্যা অহমিকার নাগপাশ থেকে। সংস্কার মুক্ত দৃষ্টিতে আধুনিক জীবন বোধের আলোকে 'মুক্তি' 'ফাঁকি' ও 'নিষ্কৃতি' নামে কবিতাগুলি লিখেছেন। কবিতাগুলির আবেদন আজও ফুরিয়ে যায়নি।

'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের 'সবলা' কবিতায় কবি বিধাতার কাছে প্রশ্ন রেখেছেন—

'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার। কেন নাহি দিবে অধিকার হে বিধাতা?

'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'সাধারণ মেয়ে' কবিতাটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থের 'বাঁশিওয়ালা' কবিতায় নারী স্বরূপকে ব্যক্ত করেছেন এভাবে—

'ঘরে কাজ করি শান্ত হয়ে; সবাই বলে ভালো,
তারা দেখে আমার ইচ্ছার নেই জোর,
সাড়া নেই লোভের।'

আবার এ কবিতায়ই—'ঘরপোষা নির্জীব নারী' একদিন 'বিদ্রোহী' রূপে জেগে ওঠে।

১৯৩৬ সালের ২রা অক্টোবর 'নারী' প্রবন্ধে লিখেছেন—"কল্পান্তের" ভূমিকায় নূতন সভ্যতা গড়বার কাজে মেয়েরা এসে দাঁড়িয়েছে—প্রস্তুত হচ্ছে তারা সর্বত্রই। তাদের মুখের উপর থেকেই যে কেবল ঘোমটা খসল তা নয়—সে ঘোমটায় তারা অধিকাংশ জগতের আড়ালে পড়ে গিয়েছিল সে মনের ঘোমটাও তাদের খসছে। যে মানব সমাজে তারা জন্মেছে সেই সমাজ আজ সকল দিকেই সকল বিভাগেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল তাদের দৃষ্টির সম্মুখে। তাদের স্বাভাবিক জীবপালিনী বুদ্ধি, কেবল ঘরের লোককে নয়, সকল লোককে রক্ষার জন্যে কায়মনে প্রবৃত্ত হবে।"

রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল আত্মঘাতী অপচয়ের অসম ইতিহাস

■ অরুণ কুমার বসু

এই রচনাটি রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলালের সম্পর্কের মৃদু খতিয়ান। সে সব আলোচনা যদিও অনেক লেখা হয়েছে, সে প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তিও কম হয়নি। সেগুলি অনেকের জানা, কারও বা ভাসা-ভাসা জানা, হয়তো অন্যমনস্ক পাঠকের খুব বেশি অন্তরঙ্গ জানা নেই। বর্তমান লেখকের রবীন্দ্রচর্চার আশু পরিধিতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কিছু মতামত ও চিন্তাভাবনা এসে পড়বে— তাই পরিচিত তথ্যের পুনরুত্থাপন ঘটবে। কিন্তু আলোচনার অভিমুখ জীবনী-ঘেঁষা নয়। কালান্তরের প্রেক্ষিতে মূল্যমানের বিচার।

২

কাবনাট্য চিত্রাঙ্গদা রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের লেখা, ভাদ্র ১২৯৯, সেপ্টেম্বর ১৮৯২-এর প্রকাশকাল, কবি যখন সদ্য একত্রিশ পেরিয়েছেন। এই অপূর্ব কাব্যনাট্যটি সমকালে বাঙালি পাঠক রবীন্দ্ররচনাকে যেভাবে গ্রহণ করতেন, সেইভাবে নিয়েছিলেন। ত্রিশ বছর বয়সের দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিক্রিয়াও কিছু প্রকাশ পায়নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্য-নাট্য-গল্প ইত্যাদি তখনই যে উৎকর্ষে পৌঁছিয়েছিল, তাতে অভিভূত মুগ্ধ হওয়ার মতো পাঠক, আঙুলে গোনা কয়েকজন ছাড়া, হয়তো শিক্ষিত বাঙালি সমাজে সত্যিই দুর্লভ ছিল। তবু ১৩০১ সালে চিত্রাঙ্গদার দ্বিতীয় সংস্করণও তো হয়েছিল। পুরাণ প্রসঙ্গ অবলম্বনে কালিদাস যে অমর কাব্য-নাটক নির্মাণ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই বয়সে প্রায় সমস্পর্ধী দক্ষতায় উপনীত হয়েছিলেন। এ সত্য আধুনিক সমালোচকরা ঘোষণা করবেন, যেমন করেছেন রবীন্দ্রজীবনীকার কৃষ্ণ কৃপালনি, চিত্রাঙ্গদা সম্পর্কে যে, this is a lyrical drama par excellence...which is one of Rabindranath's best and perhaps the only one that is flawless, if anything made by man can be called flawless. Not a line would one like to take away from it... where every utterance quivers with lyrical passion held in masterly restraint.

এই সৌন্দর্য গ্রিক ভাস্কর্যের মতো স্বর্গতুল, গথিক স্থাপত্যের মতো নিখুঁত, শেলি কিট্‌স-এর কাব্যের মতো অতীন্দ্রিয়তায় স্বপ্নশোভন।

সেই চিত্রাঙ্গদা সম্পর্কে সাহিত্যরসিক বিদগ্ধ কবি-নাট্যকার বেশ কয়েক বছর নিশ্চুপ থেকে, একেবারে সন্মার্জনী-হস্তে চিত্রাঙ্গদা-কে বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণ থেকে বিতাড়িত করার প্রতিজ্ঞায় কোমর বাঁধলেন কেন, কোন প্ররোচনায়। অবশ্য সেইসব বাদানুবাদ, রক্ষণশীল রুচিবাগীশ আক্রমণ ও ইতর তিরস্কারের কোনো অধ্যায়ই একালে অজ্ঞাত নেই। আজ দ্বিজেন্দ্রলালকেও বাংলাসাহিত্যে বাঙালি সাহিত্যরুচির দ্বারা নির্ধারিত স্থানে অধিষ্ঠিত হতে হয়েছে। তবু কাব্যরুচি শিল্পবোধ সৌন্দর্যসিদ্ধির সূক্ষ্ম বিচারের সেই সেকালের দ্বিজেন্দ্ররুচি বিচারের ঊর্ধ্বে ওঠে না, যা গেছে তা যাক এই আপ্তকাব্যের দোহাই-এ।

সমাজজীবনে দেশকালের বিবিধ কার্যকারণে এক সময়ের শিল্পরুচি যুগান্তরে বদলাতে থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের রুচির ব্যারোমিটার হঠাৎ বদলাতে লাগল কেন, তার কোনো সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা মেলে না। চিত্রাঙ্গদা প্রকাশের (১২৯৯) ষোলো-সতেরো বছর পরে দ্বিজেন্দ্রলাল সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬ সংখ্যায় লিখে ফেললেন এক রুচিলক্ষ্মীর ব্রতকথা। লিখলেন, "ঘরে ঘরে 'বিদ্যা' (বিদ্যাসুন্দর কাব্যের ইঙ্গিত) হইলে সংসার আস্তাকুড় হয়; কিন্তু ঘরে ঘরে এই চিত্রাঙ্গদা হইলে সংসার একেবারে উচ্ছন্নে যায়। ..... আর রবীন্দ্রবাবু এই পাপকে যেমন উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন তেমন বঙ্গদেশে আর কোনো কবি অদ্যাবধি পারেন নাই।"

আমাদের বিশ্বাস, দ্বিজেন্দ্রলালের স্বভাবধর্মের ভিতর ছিল একটি পরস্পরবিবাদী আত্মবিকার, স্বাস্থ্যোজ্জ্বলতার নিম্নতলে ছিল ক্ষয়গ্রস্ততার কীটাণু। আর সৌন্দর্য-উপভোগের স্বভাবলব্ধ মুগ্ধতাকেও তিনি তিরস্কৃত করেন ব্রহ্মচারী উগ্রতায়। সত্য ন্যায় শুদ্ধান্ত-চারিতার নামে স্বনির্মিত গোময়খণ্ড বলপূর্বক ভক্ষণ করাতে চান তথাকথিত ধর্মভ্রষ্টদের। যেন সেকালের এক শশধর তর্কচূড়ামণি! অথচ তাঁর নিজের 'অবতার' রচনায় এঁদেরই প্রতি কটাক্ষের অভাব নেই। একেই তো আত্মবিরোধ বলে।

৩

রবীন্দ্রসাহিত্যের এবং প্রকারান্তরে রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনা ও পারিবারিক ঐতিহ্যের উপর তালিবানি জেহাদ বিশ শতকের সূচনা থেকেই পেকে উঠছিল। এঁদের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের সদ্‌ভাব ছিল। এঁদের তালিকায় স্ববেশে ছদ্মবেশে নাম আছে চন্দ্রনাথ বসু, বিপিনচন্দ্র

পাল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি অনেকের। রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনার ইতিহাসে এঁদের সঙ্গে রবীন্দ্র-বিদূষণ-গোষ্ঠী অভিজ্ঞানটি জড়িত হয়ে গেছে, যা হল নিন্দা অসূয়া পরশ্রীকাতরতা থেকে উৎপন্ন একটি মানসিক সংকীর্ণতা। রবীন্দ্রসুহৃদ ও পরম রবীন্দ্রানুরাগী লোকেন পালিত মশায়, রবীন্দ্রনাথ যাকে 'ক্ষণিকা' উৎসর্গ করেছিলেন, তিনিও এই দলে শেষ পর্যন্ত নাম লিখিয়েছিলেন বলে জানা যায়। কবিনাট্যকার রূপে আপনার সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার পরিমাপে অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল তৎকালীন শ্লথ-স্তিমিত রবীন্দ্রবিরোধিতাকে তালিবানি সুলভ জঙ্গি পর্যায়ে ওঠাতে চাইলেন। তাই গোঁড়া সাবেক গোষ্ঠীর কারও কারও দোলাচল মনোভাব বর্জিত হল। সঙ্ঘবদ্ধ ধ্বংসাত্মক আন্দোলনে একটি মারমুখি আক্রমণ শানিত করতে চাইলেন। চিত্রাঙ্গদা প্রকাশের পর প্রকাশিত হয় সোনার তরী। তার সূচনা কবিতাটি পত্রিকায় প্রকাশিত হলে বিরোধী গোষ্ঠীর সুরেশ সমাজপতি তার প্রশংসা করে লিখেছিলেনঃ "এবারকার সাধনার আর একটি মহামূল্য অলংকার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সোনার তরী। আমরা বহুদিন এমন সর্বাঙ্গসুন্দর প্রকৃত কবিত্বময় কবিতা পড়ি নাই।...ইহার কবিত্ব ও সৌন্দর্য বচনাতীত, তাহা কেবল হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা দুরূহ।"

তারপর মতবদলের পালা। দ্বিজেন্দ্রলাল এসে সোনার তরীর অন্তঃসারদীনতা নিয়ে নতুন বিতর্ক উসকে দিলেন। কিছুকাল যে নানা পাঠক সোনার তরী কবিতার অর্থ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রবল অট্টহাসে ঘোষণা করলেন কবিতাটির কোনো অর্থই নেই। ১৩১৩ আশ্বিন সাহিত্য পত্রে 'একটি পুরাতন মাঝির গান' নামে এক প্যারিড লিখে 'একটি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা'-র শ্লেষাস্ত্রটি ছুঁড়ে চুপ করে বসে মজা উপভোগ করতে লাগলেন। প্রবাসী কার্তিক ১৩১৩ সংখ্যায় 'কাব্যের অভিব্যক্তি' লিখে রসগ্রাহী কাব্যরসিক ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রকাব্যের ফাঁপা আওয়াজ মাইকযোগে প্রচারের দায়িত্ব নিলেন। লেগে গেল তর্ক যদুনাথ সরকার ও ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। 'কাব্যের অভিব্যক্তি' প্রবন্ধে কৃষিতত্ত্ববিদ দ্বিজেন্দ্রলাল বিলেত থেকে কৃষিবিজ্ঞান শিখে আসা অধিকারে লিখেছিলেনঃ "(কবিতায়) কৃষক ধান কাটিতেছেন বর্ষাকালে শ্রাবণ মাসে। বর্ষাকালে ধান কেহই কাটে না; বর্ষাকালে ধান রোপন করে। ধান তিন প্রকার (১) হৈমন্তিক, তাহাই কৃষকের আসল ধান্য— কাটে হেমন্তকালে, অগ্রহায়ণ মাসে; (২) আশু (নিজে খাইবার জন্যই প্রায় করে) —কাটে শরৎকালে ভাদ্র মাসে; (৩) বোরো উড়িষ্যা অঞ্চলেই অধিক হয়— কাটে গ্রীষ্মকালে বৈশাখ মাসে।"

অর্থাৎ কিনা, জমিদার রবীন্দ্রনাথের কৃষিপণ্য বিষয়ে কোনো বাস্তবজ্ঞানই নেই। সোনার তরী কবিতায় বর্ণিত শ্রাবণ মাসে ধান কাটার অসংগতি ধরিয়ে দিয়ে যেন পাঠকদের দিকে চোখ টিপলেন ঃ 'কেমন দিলাম।' আবার সঙ্গে সঙ্গে লিখলেন—

"ক্ষেতখানি একটি দ্বীপ। তবে এ চর জমি। এরূপ জমিতে ধান করে না। ও সব জমি শ্রাবণ ভাদ্র মাসে ডুবিয়া থাকে।" 'এসব জমিতে ধান করে না'—ধোপে টেঁকে কি? যদি করে, তবে যে দুর্গতি হয়, তার ছবিই তো কবিতায় আছে! সোনার তরী লেখার সমকালে ছিন্নপত্রের চিঠিতে তার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, যে চিঠি তখন দ্বিজেন্দ্রলালের জানার বাইরে। বোটে বসে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ভাইঝি ইন্দিরাকে ঃ "আমার বোটের পাশ দিয়ে তাদের নৌকো যাচ্ছে আর ক্রমাগত হাহাকার শুনতে পাচ্ছি। যখন আর চার দিন থাকলে ধান পাকত তখন কাঁচা ধান কেটে আনা চাষার পক্ষে যে কী নিদারুণ, তা বেশ বুঝতেই পারছিস।"(ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ২০২)

৪

অথচ রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের আর্যগাথা-র কবিত্বের প্রতি অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সাধনায় ১৩০১ বঙ্গাব্দে। তখন থেকেই দ্বিজেন্দ্র কবিত্বের নিজস্বটুকু রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রশ্রয়ই পেয়েছিলে যেখানে গাঢ়তা ও তারল্যের সমানুপাতই ছিল মূলত দ্বিজেন্দ্র কাব্যজীবিক। দ্বিজেন্দ্রলালের 'কোরানি' কবিতাটিকে সাধনায় ছাপিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। Sublime ও ridicule -এর মিশ্রণে অম্লকষায় মিঠেকড়া তীব্রস্বাদ দ্বিজেন্দ্র-কবিধর্মকে মোটের উপর পছন্দই করেছেন রবীন্দ্রনাথ। দ্বিজেন্দ্রকণ্ঠে হাসির গান শুনে বহুবার সাহিত্যমণ্ডলীতে রবীন্দ্রনাথ নির্মল আনন্দ উপভোগ করেছেন। সাধনা ফাল্গুন ১৩০০ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'প্রেমের অভিষেক' বেরিয়েছিল। যা পরে সংশোধিত হয়ে চিত্রার অন্তর্ভুক্ত হয়। কী প্রকার সংশোধন হয়েছিল'—পরবর্তী জীবনে কবির স্বীকৃতি থেকে সেটা জানা যায়।

"প্রেমের অভিষেক-এর প্রথম যে পাঠ লিখেছিলুম, তাতে কেরানি জীবনের বাস্তবতার ধূলিমাখা ছবি অকুণ্ঠিত কলমে আঁকা, (লোকেন) পালিত অত্যন্ত ধিক্কার দেওয়াতে সেটা তুলে দিয়েছিলুম..." কথাগুলো ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায়, 'তুমি মোরে করেছ সম্রাট', তোমার যে প্রেম আমাকে রাজটীকা পরায়, সেই প্রেম আমার রূঢ়বাস্তব' কেরানির পরপদলেহী জীবনযাত্রার পক্ষে বেমানান ঠেকে— এই বোধ হয় সুহৃদদের সমালোচনার কারণ ছিল। একই কবিতায় বস্তুগত কদর্যতা ও রোমান্টিক সৌন্দর্য রবীন্দ্রকাব্যবিরোধী তো বটেই। তাই পালিতের ধিক্কার কবিরও মনে ধরেছিল নিশ্চয়। সাধনায় দ্বিজেন্দ্রলালের কেরানি- কবিতার ক্ষেত্রে সেই সঙ্কট ছিল যা। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের কবিধর্মের উপযুক্ত প্রতিনিধি মনে করেই উনিশ স্তবকে দীর্ঘ অতিপল্লবিত কেরানি জীবনের গ্লানি অবক্ষয় ও আত্মাবমাননার কাব্য বিবরণ সাধনায় স্থান পেয়েছিল, যার সামান্য নমুনা—

খেটে খেটে খেটে
এলাম যদি ক্রুদ্ধমতি অন্নপূর্ণা ভেটে,
অন্নপূর্ণার বিমুদ্রিত ইন্দীবর আঁখি
বুঝলাম খাসা তখনই যে
গিন্নীর সবই ফাঁকি।
গোঁফে দিয়ে চাড়া
নথে দিলাম নাড়া।
গিন্নী উঠলেন ফোঁস করে
সর্পের মত খাড়া;
—বেধে গেল যুদ্ধ; হল বরিষণ প্রীতি
পূর্ণ বহু ভাষা, পড়ল
ঘুমের দফায় ইতি।

(সাধনা, অগ্রহায়ণ ১৩০১; আষাঢ়ে কাব্যে সংকলিত)

এইভাবেই কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ও কবি রবীন্দ্রনাথ সমকালীন বাংলা কবিতায় বিপরীত দুই ঘরানা গড়ে তুলছিলেন। আস্বাদন-বিকর্ষে পাঠক সম্প্রদায়েরও চরিত্র বদল হচ্ছিল নিশ্চয়। রবীন্দ্রনাথের 'তোমার ও আমরা' সাধনা (পৌষ ১২৯৯) পত্রিকায় প্রকাশিত ও সোনার তরী-র অন্তর্ভুক্ত হয়ে কৌতুকপ্রিয় দ্বিজেন্দ্রলালকে সবরঙে উস্কে দিল। লিখে ফেললেন দুটি প্যারডি কবিতা। রবীন্দ্রনাথও সকৌতুকে গ্রহণ করে সাধনায় প্রকাশ করলেন। উক্ত দ্বিজেন্দ্রলালের প্যারডি পড়ে ইন্দিরা দেবী অপ্রসন্ন হয়েছিলেন। তবু সরল মনে ভাইঝিকে কবি লিখলেনঃ

"তুই আমরা ও তোমরা-লেখকের উপর ভয়ানক চটেছিস দেখলুম। লোকটা কিন্তু 'খুব মজা করেছি' মনে করে বসে আছে।" (ছিন্নপত্রাবলী পত্র ২৩৩)

দেখা যাচ্ছে ১৩০১-১৩০৩ এই সাল পর্যন্ত উভয়ের প্রীতিবন্ধন অক্ষুণ্ণ আছে। কবি তখন প্রায়শই নদীমাতৃক জমিদারিতে ভ্রাম্যমাণ। কর্মসূত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল সস্ত্রীক শিলাইদহে অতিথি, রঙ্গেবসে গানে গল্পে দুজনেই প্রীতিবদ্ধ। দ্বিজুবাবুর হাসির গানে কবি অনুরক্ত, তাঁর ডাকাতে ক্লাবের জন্যে রবীন্দ্রনাথ লিখে দিচ্ছেন 'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল' গানটি।

এবার 'তোমরা-আমরা-তোমরা' এই রসত্রিবেণীতে প্রবেশ করা যাক। রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে অংশত স্মরণ করছি ঃ

"তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও,
কুলুকুলুকল নদী স্রোতের মতো,
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি
মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।
আপনা আপনি কানাকানি কর সুখে,
কৌতুকছটা উথলিছে চোখে মুখে,
কমলচরণ পড়িছে ধরণী মাঝে
কনকনূপুর ঝিনিকি বাজে..."

পুরুষের রোমান্টিক দৃষ্টিতে নারীর ললিতলোভনলীলায় এই মধুর গীতি কবিতা নিজ গুণেই গান হয়ে উঠতে চায়। এই জাতীয় কবিতায় নিরালায় মুগ্ধকণ্ঠে আবৃত্তি করার সুখ যেন পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল কোনো রোমান্টিক ভ্রান্তিবিলাসের ফাঁদে পা দেবেন না, এই তাঁর পণ। বস্তুজগতের স্থূল কার্কশ্যকে তিনি মোহিনীমায়ার বিহ্বলতা দিয়ে ঢাকেন না। ইসকাপনের তাস তাঁর কাছে শুধুই ইসকাপনের তাস। তাই মজায় মজে রোমান্টিক কবিকৃতির প্রতিমা চূর্ণ করে ভিতর থেকে খড়ের কাঠামো বের করে আনার উল্লাসের নামই দ্বিজেন্দ্রলাল। তাই অনেক কবিতাই হয়ে যায় প্যারডি, কোনো দৃশ্য-সুদৃশ্যের অনুকৃত মুখবিকার। তাকে নির্মল বিশুদ্ধ হাস্যরস বলা যাবে কিনা সেটা প্রতি প্যারডির বিকৃতির বর্ণমালার উপর নির্ভর করে। রবীন্দ্রনাথের তোমরা ও আমরা-য় দ্বিজেন্দ্রলাল অফুরান প্যারডির উসকানি পেয়ে গেলেন। কিছু উদাহরণঃ

"আমরা খাটিয়া বহিয়া আনিয়া দেই
আর তোমরা বসিয়া খাও
আমরা দুপুরে আপিসে ঘামিয়া মরি
আর তোমরা নিদ্রা যাও।
বিপদে আপদে আমরাই পড়ে লড়ি
তোমরা গহনাপত্র ও টাকা কড়ি
অমায়িকভাবে গুছায়ে পালকি চড়ি
দ্রুত চম্পট দাও।"

তারপর বিষয়টির সর্বপারিবারিক সরসতার গুণে, পুরুষের উক্তি মহাকাব্যিক প্রসারতা পেতে থাকে। এরপর ইসকাপনের গোলামের মুখের উপর ইসকাপনে বিবির কযোদ্‌গার ঃ

"তোমরা হাসিয়া খেলিয়া বেড়াও সুখে
ঘরে আমরা বদ্ধ রই।
তোমরা কিরূপে কাটাও দীর্ঘ বেলা
তাই ভাবিয়া অবাক হই।
আপিসে কাটাও তামাক-গল্প-গুজবে
পরে হজগজ সাহেবকে দুটো বুঝোবে
পরে আপনার কাগজপত্র গুছোবে
শেষে করে গোটাকত সই।"

কিন্তু 'এমনি করেই যায় যদি দিন' গেল না। নির্দোষ রসিকতায় কালিমা লাগে, পাষাণে কীট প্রবেশ করে। রবীন্দ্রনাথের 'তোমরা ও আমরা' স্বয়ং কবিপুরুষের দৃষ্টিতে নারীস্তব, Ode to Women, নিপুণতার মহিমা ঃ

আমরা বৃহৎ অবোধ ঝড়ের মতো
আপন আবেগে ছুটিয়া চলিয়া আসি।
বিপুল আঁধারে অসীম আকাশ ছেয়ে
টুটিবারে চাহি আপন হৃদয়রাশি।
তোমরা বিজুলি হাসিতে হাসিতে চাও
আঁধার ছেদিয়া মরম বিঁধিয়া দাও,
গগনের গায়ে আগুনের রেখা আঁকি
চকিত চরণে চলে যায় দিয়ে ফাঁকি।
অযতনে বিধি গড়েছে মোদের দেহ,
নয়ন অধর দেয়নি ভাষায় ভরে।
মোহন মধুর মন্ত্র জানিনে মোরা,
আপনা প্রকাশ করিব কেমন করে?
তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি,
কোনো সুলগনে হব না কি কাছাকাছি।
তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাবে,
আমরা দাঁড়ায়ে রহিব এমনিভাবে।

পুরুষ নারীর রহস্য-দূরত্বের এই অনতিক্রমনীয় রোমান্স সহজে ভেঙে দিতে পারেন দ্বিজেন্দ্রলাল। নির্মল নয়, নির্মম কঠিন রক্তহাস্যে। নারী-পক্ষের ব্রিফ নিয়ে তিনি সওয়াল-জবাব করেছিলেন ঃ

দুধের সরটি ক্ষীরটি তোমরা খাও
আর মোরা খাই তার দহি
যতক্ষণটি তোমরা না বাড়ি ফেরো
ঘরে মোরা উপবাসে মরি।
তোমরা খাইবে আমরা বসিয়া রাঁধিব

না খাইলে গিয়া মাথার দিব্যি সাধিব
তোমরা বকিলে আমরা বেচারি কাঁদিব,
তাও তোমাদের সহে নাই।

শুধু প্যারডি কেন? স্পষ্টবাদী বস্তুব্যাপারী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বিজেন্দ্রলাল রোদ-চশমা পরে প্রকৃতি দেখতেন না। রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল দুজনেই পুরী গেলেন, সমুদ্র দেখে কবিতাও লিখলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,

হে আদি জননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে, তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন; তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অন্তরে, মহেন্দ্রমন্দির-পানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গলগানে
ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি; তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চুম্বন করে আলিঙ্গনে সর্ব অঙ্গ ঘিরে
তরল বন্ধনে বাঁধি নীলাম্বর অঞ্চল তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি সন্তর্পণে দেহখানি তার
সুকোমল সুকৌশলে।

পুরীতে সমুদ্র দর্শনের প্রতিক্রিয়াই কবিতার জন্ম দিল। কিন্তু কবির আশ্চর্য কল্পদৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে দৃশ্যমান বর্তমানে নয়—শত লক্ষ কোটি বৎসর পূর্বের দ্যাখা পৃথিবীর আদি জননী যে বিশ্বসিন্ধু তার প্রতি! কত লক্ষ বছরের পর তার অতল জলগর্ভ থেকে মৃত্তিকাময়ী বসুন্ধরা—কন্যাটি জন্মলাভ করল। সেই সদ্যোজাত সন্তানের প্রতি আদিমাতার গাঢ় মমতাময় স্নেহবন্ধনে মর্ত্যলীলা কবিতার বিষয়। কোথায় ভৌগোলিক বঙ্গোপসাগর, কোথায় পুরী? কবিতার সূচনাটি মাতৃসম্বোধনে উচ্চারিত বাক্যঃ হে আদিজননী সিন্ধু! তারপর সেই আদিমতম আদিমাতার কোলে এক সদ্যজাত কন্যা। এই পর্যন্ত কবিতাটির প্রথম বাক্য। সদ্য মাতৃত্বলাভের মানবিক লক্ষণগুলি অপরূপ কবিত্বের পর পর উপবাক্যে সাজানো—

'তাই তন্দ্রা নাহি আর চক্ষে তব'

'তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা সদা আশা সদা আন্দোলন'

'তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা...'

'তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে অসংখ্য চুম্বন কর, আলিঙ্গনে সর্ব অঙ্গ ঘিরে'

প্রসূতি ও সদ্যোভূমিষ্ঠার মহাসামুদ্রিক স্নেহবাৎসল্যের এই রূপকল্পনা বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাকশিল্প হয়ে উঠেছে। যেন একখানি ধ্বনিময় বতিচেল্লি, একটি স্পন্দমান র‍্যাফায়েল।

সেই তুলনায় দ্বিজেন্দ্রলালের সমুদ্রের প্রতি (মন্দ্র কাব্যে) কী অ্যান্টি-রোমান্টিক! যেন বেলাভূমিতে আছড়ে-পড়া সফেন ঢেউয়ের পাশে বাস্তবের খুরি-শালপাতা-কলাপাতা-ভাঁড়ের আবর্জনা জলে হাবুডুবু খাচ্ছে! সাব্লাইম কি কিছুই নেই? পাঠকরা খুঁজে দেখুন না হয়ঃ

তুমি যে হে গর্জিতই! চট কেন? শোন পারাবার।
দুটো কথা বলি শোন। তোমার যে ভারি অহংকার।
শোন এক কথা বলি। দিনরাত করিছ যে শোঁ শোঁ;
তোমার কি কাজকর্ম নাই? আহা চট কেন? রোসো।
শুদ্ধ নিন্দবাদী আমি? তবে শোন দুটি স্তুতিবাণী,—
বলেছি 'যা প্রাপ্যমাত্র তাহা আমি করিব না হানি।"
—না না তুমি ভাঙো বটে; কর চূর্ণ যাহা পুরাতন
কিন্তু তুমি নবরাজ্য পুনরায় করিছ সৃজন;
ব্যাপ্তিসম, কালসম, সৃজনের বীজমন্ত্র মত
এক হাতে নাশ তব; এক হাতে গঠনে নিরত;
যুগে যুগে বয়ে যাও গভীর কল্লোলি নিরবধি;
ন্যায়সম নিঃসঙ্কোচে নিজ কার্য সাধিছ জলধি।

রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র কাব্যের প্রতিতুলনা কবি বিশেষের গৌরব-অগৌরব প্রচারের স্বভাবদুষ্টতা বলে পাঠক গ্রহণ করবেন না। আধুনিক প্রজন্মের কাছে দ্বিজেন্দ্রলালের খ্যাতি তাঁর নাট্যকার সত্তায় ও সংরক্ষিত কিছু দ্বিজেন্দ্রনীতিতে। অথচ রবীন্দ্রনাথের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে তাঁর নৈতিকতা-দন্ডধারী হুংকার ও রবীন্দ্র বিদূষণ, তাঁর ঈর্ষাপরায়ণতার লক্ষণ বলে প্রচার করা হয়। তাতে অনেক পরিমাণে অতিশয়োক্তি ও অপব্যাখ্যা আছে, তা সমাজবিজ্ঞানসম্মত বিচার নয়। মনে হয় কর্মক্ষেত্রে বিদেশি শাসকদের কাছে অবিরাম পাওয়া অসম্মান ও আত্মাবমাননা, এবং মধ্যবিত্তসুলভ কিছু অন্তর্মুখী স্ববিরোধিতা দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তি স্বভাবটিকে তির্যকভাবে গড়ে তুলেছিল। এই আত্মঘাতী স্ববিরোধিতা ঔপনিবেশিবাদের এক ভয়ংকর ফল, এক দুরারোগ্য মনস্তত্ত্ব, যা তাঁকে আমৃত্যু ক্ষমতাহত করেছে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা-সমালোচনাটি থেকেই এই স্ববিরোধিতা বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীর। "দ্বিজেন্দ্রলাল লিখলেনঃ

আর বলিব কী(চিত্রাঙ্গদার কথা) অর্জুন কিভাবে বর্ষাকাল দ্বিধা নাই...সঙ্কোচ নাই..... ধর্ম নাই.... কেবল নিত্য ভোগ .....ভোগ...আর নির্লজ্জভাবে তাহার বর্ণনা। আর কেবল রূপটি নিজের নহে বলিয়া আত্মগ্লানি। দুঃখ তাহা নহে যে কালরাত্রি কালে কি করিলাম; দুঃখ এইমাত্র— হায়, আমি যদি সুরূপা হইতাম তাহা হইলে আরও উপভোগ করিতাম।"

বোঝাই যায়, চিত্রাঙ্গদার সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের কণামাত্র তাঁর বোধগম্য হয়নি! তাই দ্বিজেন্দ্রলালের এই জাতীয় এ কালের কপালে ভাঁজ ফেলে। উচ্চশিক্ষিত, ইংরাজি সাহিত্যরসে বিদগ্ধ বাঙালির ভাষা? কোন কাব্যাংশ তাঁকে এই উপবীতস্পর্শী রুদ্রচণ্ড দুর্বাসায় পরিণত করল? পাঠকদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য কাব্যনাট্য থেকে অংশবিশেষ তুলতে হবে। অভিযোগ—'কেবল নিত্য ভোগ, ভোগ আর নির্লজ্জভাবে তাহার বর্ণনা?' এমন অংশ কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না। বরং মদনের বরে অলৌকিকভাবে রূপবতী পূর্ণিমা চিত্রাঙ্গদার প্রতি অভিভূত অর্জুন, বিস্ময়স্ফীত স্মিতস্নিগ্ধ চোখে চিত্রাঙ্গদাকে দূর থেকে অপলক দেখছেন। না, মাংসাশী শ্বাপদদৃষ্টি নয়— রূপমুগ্ধ স্তব্ধবাক্ এক বিস্ময় মাত্র! তাঁর মন বুঝে চলেছে এই ভাবনার জালঃ

ভাবিলাম মনে, ধরণী খুলিয়া দিল
ঐশ্বর্য আপন। কামনা সম্পূর্ণতা
চমকিয়া মিলাইয়া গেল। ভাবিলাম

কত যুদ্ধ কত হিংসা কত আড়ম্বর
পুরুষের পৌরুষগৌরব, বীরত্বের
নিত্য কীর্তি তৃষ্ণা, শান্ত হয়ে লুটাইয়া
পড়ে ভূমে, ওই পূর্ণ সৌন্দর্যের কাছে।
পশুরাজ সিংহ যথা সিংহবাহিনীর
ভুবনবাঞ্ছিত অরুণ চরণতলে।

কাব্যে নীতি প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের খোঁচাটি কোথায়? তাঁর ব্যাখ্যায়, যেন চিত্রাঙ্গদা বলতে চাইছে—'রূপটি কেবল নিজের নহে বলিয়া আত্মগ্লানি; দুঃখ তাহা নহে যে কল্য রাত্রিকালে কী করিলাম। দুঃখ এই মাত্র যে—হায় আমি যদির সুরূপা হইতাম, তাহা হইলে আরো উপভোগ করিতাম, বর্ষাকালের ভিতর কি পরেও ব্যাভিচারিণীর একদিনের জন্যও অনুতাপ হইল না।'

কিন্তু রবীন্দ্র-চিত্রাঙ্গদায় অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার সংলাপে এজাতীয় উক্তি তো নেই। একবার দ্বিজেন্দ্রলাল তাকে ব্যভিচারিণী বলে শাপান্ত করলেন, আবার, 'মা চিত্রাঙ্গদা—তোমার এই শ্লীলতাহানির জন্য সমগ্র নারী সমাজের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী, এই রকম নাটকীয় ভাষাও ব্যবহার করেছিলেন তিনি! কাব্যে কিন্তু দেখা যাচ্ছে, চিত্রাঙ্গদা স্বয়ং মদনের কাছে তাঁর বিষণ্ণ মধুর অভিজ্ঞতা জানাচ্ছে ঃ

মীনকেতু

কোন মহারাক্ষসীরে দিয়াছ বাঁধিয়া
অঙ্গসহচরী করি ছায়ার মতন—
আজ প্রাতে উঠে নৈরাশ্যাধিক্কারবেগে
অন্তরে অন্তরে টুটিছে হৃদয়। মনে
পড়িতেছে একে একে রজনীর কথা।
বিদ্যুৎ বেদনাসহ, হতেছে চেতনা
অন্তরে বাহিরে মোর হতেছে সতিন,
আর তাহা নারিব ভুলিতে। সপত্নীরে
স্বহস্তে সাজায়ে সযতনে, প্রতিদিন
পাঠাইতে হবে আমার আকাঙ্খাতীর্থে
বাসর শয্যায়, অবিরাম সঙ্গে রহি
প্রতিক্ষণ দেখিতে হইবে চক্ষু মেলি
তাহার আদর। ওগো দেহের সোহাগে
অন্তর জ্বলিবে হিংসানলে, হেন শাপ
নরলোকে কে পেয়েছে আর। হে অতনু,
বর তব ফিরে লও।

হায় কী দুরদৃষ্ট কবি দ্বিজেন্দ্রলালের। এই আশ্চর্য রবীন্দ্রব্যাখ্যাত রমণী-রহস্যের কণামাত্র স্বাদ দিজেন্দ্রলাল পেলেন না। এমন হতমান তাঁর সাহিত্যভাগ্য। ' হেন শাপ নরলোকে পেয়েছে আর'। হায় দ্বিজেন্দ্রলাল, আপনাকে কী কষ্ট করে স্বীকার করতে হয়েছে ঃ "আমি চিত্রাঙ্গদার সমালোচনা করিতে বসি নাই। ইহার সুন্দর ভাষা ও মধুর ছন্দোবদ্ধ, ইহার উপমার ছটা অতুলনীয়।" লিখতে হয়েছেঃ "মাইকেলের পর এত মধুর অমিত্রাক্ষর বোধ হয় আর কেহই লিখিতে পারে নাই।" তাতে কী? দ্বিজেন্দ্রলালকে এর পরেও শ্বাসরুদ্ধ করে লিখতে হল ঃ 'তথাপি এই পুস্তকখানি দগ্ধ করা উচিত।"

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের, বাঙালি সমাজের, বাংলা ভাষার দুর্ভাগ্য, চিত্রাঙ্গদা পুস্তকখানিকে তালিবানরা এসে দগ্ধ করেনি।

কাব্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা রবীন্দ্রনাথের জীবনসায়াহ্নে নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদায় রূপান্তরিত হয়ে কালের কপোলতলে চিরসমুজ্জ্বল হয়ে আছে।

সংসার উচ্ছন্নে যায়নি।

তাই 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না', 'আহা জাগি পোহাল বিভাবরী', 'তুমি যেয়ো না এখনি এখনো আছে রজনী', 'ও যে মানে না মানা', 'না বলে যেয়ো না চলে' প্রভৃতি প্রেমসংগীতগুলি সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল যে একদা খড়গহস্ত ছিলেন, তা অনেকেরই জানা আছে। এগুলি তো লাম্পট্যের গান, দুশ্চরিত্রতার প্রকাশ্য সমর্থন, এই ক্ষমাহীন অপরাধে রবীন্দ্র তিরস্কারে দ্বিজেন্দ্রলালের ক্লান্তি ছিল না। যখন চিত্রাঙ্গদা সম্পর্কে বলেছিলেন, 'চিত্রাঙ্গদা শুধু কুৎসিত নহে, ইহা ভয়ানক। এইরূপ রচনাকে কাব্যকুঞ্জ হইতে দূর করিবার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করা প্রত্যেক সাহিত্যিকের কর্তব্য।' আর গানগুলির অপরাধ? এ সব গানে— "বঙ্গ সাহিত্যের কী অনিষ্ট হইয়াছে বুঝাইয়া দিতেছি। এদেশের কাব্যরাজ্যে অভিসার বহুকাল হইতে প্রচলিত। অভিসার জিনিসটা খারাপ।...ইহা পুরাকালে থাকিলেও , Immoral, না থাকিলেও Immoral । পূর্ববর্তী কবিগণ সাময়িক নীতি ও রুচির বাতাসের মধ্যে লালিত হইয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে তাহাদের দোষ মার্জনা করা যায়। কিন্তু এখন রুচি হিসাবে বিশুদ্ধতর বাতাস সেবন করিয়া কেহ সেরূপ লিখিলে মার্জনা করিব কেন?'

রবীন্দ্রনাথের অনৈতিক, অসামাজিক অবৈধক মার্জনা করার অক্ষমতা থেকে তিনি রচনা করেছিলেন 'আনন্দবিদায়' প্যারডি নাটক, যদিও বাঙালি দর্শক সে প্রহসন গ্রহণ করেননি। তাঁর জীবনখানিও পঞ্চাশ পূর্ণ হতে না হতে হঠাৎ অকালে নির্বাপিত হয়ে গেল! তাঁরই চন্দ্রগুপ্ত নাটকে সৃষ্ট চানক্যের মতো ক্রোধে অভিশাপ দিতে দিতে তিনি নিষ্প্রভ হয়ে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রবীণ বয়সে লেখা শাপমোচন পালানৃত্যনাট্যে কুৎসিত রাজার রূপ দেখতে পেয়ে রানির যে আত্মগ্লানি, সেই তিক্ততার মুখে অন্ধকার রাজা রানিকে বলেছিলেন, 'যাকে দয়া করলে যেত তোমার হৃদয় ভরে, তাকে ঘৃণা করে কেন পাথর করলে মনকে?' কিন্তু রানির চরম বিরক্তির হেতু : 'রস বিকৃতির পীড়া সইতে পারিনে"।

শাপমোচন শেষ পর্যন্ত রাণির শাপমোচন ঘটেছিল। কিন্তু চাণক্যের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলাল যেন চাণক্যের ভাষা দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। এই রকম ভাবতে বাধ্য হই আমরা। চাণক্যের সেই ভাষা :

ঐ বদ্ধ জলার ওপরে একটা ধোঁওয়ার কুণ্ডলী উঠছে। পচা হাড়ের দুর্গন্ধে বাতাসের যেন নিজেরই নিশ্বাস আটকে আসছে। ঘেয়ো কুকুরের বিকট ঘেউ ঘেউ শব্দ পরিত্যক্ত প্রান্তরের স্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। হে সুন্দরী বীভৎসতা! তুমি এত সুন্দরী! তাই আমি গ্রাম পরিত্যাগ করে নিত্য প্রত্যুষে তোমার কদর্যতায় স্নান করতে ধেয়ে আসি; তুমি আমার অনেক শিখিয়েছ প্রেয়সী আমার! তুমি আমায় অনেক শিখিয়েছ—সংসারকে ঘৃণা করতে, ক্ষমতাকে তুচ্ছ করতে,

ঈশ্বরের অত্যাচারের বিপক্ষে সোজা হয়ে, বুক ফুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে। হে সুন্দরী, আমায় সংসার হতে আরও দূরে টেনে নিয়ে যাও,—যতদূর পারো। নরকে যেতে হয়, তাও ভালো; শুদ্ধ শুদ্ধ সংসার থেকে দূর হয়ে।”

শেষ পর্যন্ত হারানো কন্যাকে ফিরে পেয়ে চাণক্য তার শুষ্করুক্ষ শূন্য জীবনে খুঁজে পেয়েছিল স্বর্গীয় করুণা। মহাসিন্ধুর ওপার থেকে ভেসে আসা যে অপার্থিব সুর তাই চাণক্যকে এবার চরম সার্থকতার পথে নিয়ে যাবে। এই অলৌকিক বিশ্বসংগীত নিয়েই তো সারা জীবন কাটিয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। সেই সিন্ধুপারের সুর কি তাঁর জীবনের শেষ প্রহরটি স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে দেবে না? সংসারের যাবতীয় ইতর কোলাহল, সংকীর্ণ পরচর্চা, কলুষ-কল্মষ বিরোধ বিদ্বেষ থেকে সংগীত তাঁকে নিশ্চয় মুক্তি দিয়েছিল : সেই মুক্তির গানই দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বোত্তম সৃষ্টি :

ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে
কি সঙ্গীত ভেসে আসে।
কে ডাকে মধুর তানে কাতর প্রাণে আয় চলে আয়
ওরে আয় চলে আয় আমার পাশে।
বলে আয়রে ছুটে আয়রে ত্বরা
সেথা নাইরে মৃত্যু নাইরে জরা,
হেথা বাতাস গীতিগন্ধ ভরা
চির স্নিগ্ধ মধু মাসে।
হেথায় চিরশ্যামল বসুন্ধরা
চিরজ্যোৎস্না নীলাকাশে
কেন ভূতের বোঝা বহিস পিছে
ভূতের বেগার খেটে মরিস পিছে,
দেখ ঐ সুধা সিন্ধু উথলিছে
পূর্ণ ইন্দু পরকাশে।
ভূতের বোঝা ফেলে ঘরের ছেলে
আয় চলে আয় আমার পাশে।
কেন কারাগৃহে আছিস বন্ধ,
ওরে ওরে মূঢ়, ওরে অন্ধ!
ওরে সেই পরমানন্দ যে আমারে ভালোবাসে।
কেন ঘরের ছেলে পরের কাছে
পড়ে আছিস পরবাসে।

কী দরকার ছিল এই অসম যুদ্ধের।

লেখকের অনুমতিক্রমে পুর্নমুদ্রিত

ভারতীয় সংগীতের উৎকর্ষ সন্ধানে

■ ডঃ স্নিগ্ধতনু বন্দ্যোপাধ্যায়

সংগীত নিয়ে লিখতে বসে একটা কথা মনে হচ্ছে, সংগীত আধুনিক সময়ে কোন দিকে মোড় নিয়েছে--- ভালো গানবাজনার সংজ্ঞা কি? এর চাবিকাঠিই বা কোথায়? শুধু আবেগকে পুঁজি করে এর দিশা পাওয়া সম্ভব? নাকি শাস্ত্র সম্বল করে ইতিহাসের পাতায় চোখ রেখে এর হদিশ করি? ভালো গানবাজনা, তা শাস্ত্রীয় বা লৌকিক আচার সমন্বিত যাই হোক না কেন শ্রবণেন্দ্রিয়ের পক্ষে তা অতি সুখকর।

সামবেদ ভারতীয় সংগীতের উৎসস্থল। বৈদিক সামগান পেরিয়ে সামগানের সঙ্গে সম্পর্কিত পরবর্তীকালের সংগীত প্রাচীন ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত ছিল। কতগুলো শাস্ত্রীয় নিয়ম অনড়ভাবে পালিত হতো। জাতি, গ্রামরাগ, দশ- লক্ষণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত গীতি সকল গান্ধর্ব-সংগীত নামে বিশেষিত। এই সংগীত মার্গ সংগীত নামেও পরিচিত ছিল। পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বা অঞ্চলে লোকরঞ্জনার্থে প্রচলিত প্রয়োগ নির্ভর সংগীত ছিল দেশী সংগীত। শাস্ত্রের বন্ধনে এই সংগীত নিবিড়ভাবে আবদ্ধ ছিল না; বরং পরিবর্তনশীলতাই এই গীতির লক্ষণ বা শাস্ত্র হিসাবে নিয়ন্ত্রিত বা পরিগণিত হতো।

সর্বযুগে সর্বদেশে লোকসংগীত জনপ্রিয়; কারণ সাধারণ মানুষ এই সংগীতের সাথে সহজে একাত্ম হতে পারে। ভারতবর্ষের গ্রামগঞ্জের খেটে খাওয়া মানুষজন মনের স্বাভাবিক প্রেরণা থেকে পল্লী-সংগীতের জন্ম দিয়েছিলো। শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে লোকাচার সমন্বিত গান লোকগান বা লোকসংগীত নামে পরিচিত। প্রচলিত সুরের কাঠামোয় এই গান গীত হয়ে থাকে।

গান্ধর্ব সংগীতে প্রয়োগবিধির অস্বাভাবিক কাঠিন্যের জন্য সর্বসাধারণের অধরা; গুপ্ত যুগে এর আগে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের সাথে সাথে দেশী সংগীত অত্যধিক প্রাধান্যপ্রাপ্ত এবং গান্ধর্ব সংগীতের ঐতিহ্য ক্রমহ্রাসমান হয়। গন্ধর্ব গুণীরা দেশী গানের সুরের কাঠামোর কিছু নিয়ম তথা লক্ষণ প্রযুক্ত করে অভিজাত দেশী সংগীতের সৃষ্টি করেন। বস্তুতঃ দেশী সংগীতের সাথে মার্গ সংগীতের মেলবন্ধন ঘাটিয়ে মার্গ-দেশী সংগীত বা প্রবন্ধ সৃষ্টি করলেন। যার ফলশ্রুতি হিসাবে পরবর্তীকালে হিন্দুস্থানী সংগীতের জগতে প্রবন্ধের পরিবর্তিত রূপ হিসাবে আমরা ধ্রুপদ, ধামার, খয়াল, টপ্পা, ঠুম্‌রি প্রভৃতি গীতশৈলীগুলি পেয়ে থাকি।

গন্ধর্বরা ভারতীয় গানবাজনায় নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন গান্ধর্ব সংগীত তথা দেশী সংগীতে। সংগীতে তাঁরা স্বর, তাল এবং পদের সমন্বয় করেছিলেন। প্রবন্ধের যুগে পৌঁছে সংগীত চার ধাতু এবং ছয় অঙ্গ বিশিষ্ট হয়। যদিও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রবন্ধ ভেদে সমস্ত ধাতু এবং অঙ্গ একত্রে ব্যবহৃত হতো না; ধাতু এবং অঙ্গ সংখ্যার ভিন্নতা আলাদা আলাদা প্রবন্ধকে স্বীকার করতো। শাস্ত্রে বর্ণিত সংগীত নিবদ্ধ এবং অনিবদ্ধ ভেদে দু প্রকার। অনিবদ্ধ অংশ তাল ছাড়া গাওয়া বা বাজানো হতো। এই অংশ আলপ্তি (প্রাচীন নাম) বা আলাপ (আধুনিক) নামে পরিচিত। নিবদ্ধ অংশ তালে গীত অথবা বাদিত হতো। আলাপ ব্যতীত নিবদ্ধ সকল প্রবন্ধ 'আক্ষিপ্তিকা' নামে পরিচিত। সুতরাং শাস্ত্র মতে সমস্ত নিবদ্ধ গানই আক্ষিপ্তিকা বা প্রবন্ধ (Composition)। অর্থাৎ ধ্রুপদ, খয়ালের বন্দিশ যেমন এই শ্রেণীভুক্ত, তেমনি আক্ষিপ্তিকা বলতে রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, রজনীকান্তের গান, দ্বিজেন্দ্রগীতি, অতুলপ্রসাদী, লোকসংগীত সবকিছুই বোঝায়।

শাস্ত্রে বর্ণিত প্রাচীন ধ্রুবপদ, বিষ্ণুপদ প্রভৃতি সবই প্রবন্ধ (Composition) ভারতের প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে এই সকল পদের শীর্ষে রাগ নাম থাকলেও সাদামাটা ধর্মীয় গান হিসাবেই এগুলি গীত হতো। রাগ সংগীত গাইতে গেলে রাগে আলাপ একান্ত জরুরি। নানা অলংকার সংযোগে গীত পদ (প্রবন্ধ) ঘরানাদার কলাবন্তদের(কলাবৎ) হাতে পড়ে দরবারে গীত হয়ে দরবারী রূপ পরিগ্রহ করে এবং দরবারী সংগীতে (Classical Music) পরিণত হয়। এর অন্য নামগুলি হলো শাস্ত্রীয় সংগীত, উচ্চাঙ্গ সংগীত, মার্গ সংগীত(আধুনিক পরিভাষা)।

শাস্ত্রীয় সংগীত (Scriptural Music) অর্থাৎ শাস্ত্রসম্মত সংগীত; শাস্ত্রের কিছু নিয়ম কানুন মেনেই এই সংগীত সৃষ্টি হয়েছে। যদিও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সংগীতের বা লক্ষ্যসংগীতের (Practical Music) লক্ষণই শাস্ত্র হিসাবে মানা হয়ে থাকে তা জনচিত্তের মনোরঞ্জন তথা মান্যতাকে মাথায় রেখে। উচ্চাঙ্গ সংগীত এই কারণে যে, তা উচ্চমানের সংগীত। সংগীতের নানা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বা পর্ব সন্নিবিষ্ট হয়েছে এতে। আধুনিক পরিভাষায় মার্গ কথাটিও রাগ

সংগীতের ক্ষেত্রে জুড়ে গেছে। যদিও প্রাচীন গান্ধর্ব বা মার্গ সংগীত সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। বস্তুতঃ রস সৃষ্টির অনেক উপাদান তথা অলংকরণ প্রক্রিয়া এই সংগীতে নিহিত,যাতে সৃজনশীলতার ব্যাপক প্রকাশ সম্ভব। নতুন নতুন পথ প্রদর্শনের পূর্ণ সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে আছে এই সংগীতে; যে কারণে এই সকল নামকরণ।

তাহলে, আলাপ ছাড়া নিবন্ধ গান প্রবন্ধ গান হলো প্রবন্ধ (Composition) বা আক্ষিপ্তিকা-- একটি বিশিষ্ট রচনা রীতি, যাতে বাণী (কথা) এবং সুরের কাঠামোর সঠিক প্রয়োগ প্রযোজ্য, তাদের যথেচ্ছ সঞ্চরণ নয়। প্রবন্ধে আলাপ সংযুক্ত হলে তা রাগ সংগীতের দায়রায় পড়ে। ভারতীয় সংগীতের আধার (base) হলো রাগ। বিশিষ্ট স্বর সমষ্টির (Combination of notes) সহায়তায় নির্দিষ্ট রাগ-রাগিণীর উদ্ভব হয়। এই combination রাগ ভেদে (according to raga) আরোহী (ascending) অবরোহী (descending) অথবা উভয়ই হতে পারে। এছাড়াও নির্দিষ্ট কিছু শর্ত আছে রাগ পরিবেশনে--- বা রাগ-লক্ষণ নামে পরিচিত। গানে এই লক্ষণ নিষ্প্রয়োজন। গান এবং রাগের মধ্যে এককথায় পার্থক্য --- গান হলো কথা ও সুরের সমন্বয়ে সৃষ্ট ভাব বিশিষ্ট রচনা। রাগে নির্দিষ্ট সুর কাঠামো থাকে রাগ প্রকাশক বিশিষ্ট স্বর সমষ্টির মাধ্যম, যাকে বলা বলা হয় পকড় বা Phrase । Phrase -এর যথার্থ প্রয়োগ রাগের বন্ধনকে দৃঢ় করে, যা বন্দিশ বা চীজ (Composition) নামে পরিচিত।

Classical Music - এর বন্দিশে কাব্য (Lyric) থাকলেও অনেক সংগীত গুণী কাব্যগুণকে গৌণ স্বীকার করে পকড় (Phrase) কে প্রধান্য দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ মিঞা কি মল্লার রাগের বিলম্বিত বন্দিশ " করিম নাম তেরো ...."-তে বর্ষার বর্ণনা না থাকলেও রাগবাচক স্বরসমষ্টির যথার্থ প্রয়োগ রাগের আবহ সৃষ্টির একান্ত সহায়ক দেখা যায়। বস্তুতঃPhrase গুলি ভাবের অনুষঙ্গ হিসাবে রাগকে (Indian Melody) সুষমামন্ডিত করে তোলে।

রাগ এবং গানের তফাৎ সম্পর্কে একটা ধারণা আমরা পেলাম। এবার ভালো গানবাজনার প্রসঙ্গে আসা যাক। সংগীত উৎকর্ষের পশ্চাতে ক্রিয়াত্মক সংগীত শিল্পী-ই (Performing Artist) শুধু নয়; ছাত্র(Student) শিক্ষক (Teacher\ Guru), সমালোচক (Critic) গবেষক (Researcher), সংগীতশাস্ত্রী (Musicologist) নির্বিশেষে সংগীতের প্রতি অনুরক্ত সকল মানুষের (Music Lover) সম্মিলিত প্রচেষ্টা এক্ষেত্রে জরুরি।

উদাহরণ সহযোগে বিশ্লেষণ করা যাক। শুধুমাত্র শ্রুতিমাধুর্য এবং সুকণ্ঠ (Pleasant sound and good quality of voice) ভালো গানবাজনার মাপকাঠি হতে পারে না। ভালো গানবাজনার সাথে আরও কিছু উপাদান যুক্ত থাকে। যেমন নির্দিষ্ট গীতশৈলীর বৈশিষ্ট্যাবলী বা পারম্পর্য (Orders or steps) গীতে প্রযুক্ত অলংকার (Embellishments used in a particular form of music); শিল্পীর রসবোধ (Sense of Art) এবং সহজ সঞ্চারমানতা (Easy communication of Art) । ক্রিয়াত্মক সংগীত শিল্পীদের অধিকাংশের ঔপপত্তিক জ্ঞানের (Theoretical knowledge) প্রতি ঔদাসীন্য বা বীতরাগ নয়, অনুরাগেই সংগীতের প্রকৃত উ ৎকর্ষ সাধন সম্ভব।

সংগীত আজ শিক্ষাঙ্গনে পাঠ্যসূচীর (Syllabus) আকারে স্বমহিমায় বিরাজ করছে। সংগীতকে ভালোভাবে বুঝতে গেলে শাস্ত্র সমর্থিত সাংগীতিক পরিভাষাগুলিকে (Terminology) উপলব্ধি করা প্রয়োজন। সংগীতের উপযোগিতা এবং সঠিক প্রয়োগ (Utility & proper application) সম্বন্ধে তবেই সুবিচার সম্ভব। মাঝিমাল্লা বা রাখাল বালকের স্বতঃস্ফুর্ত গান অথবা গ্রাম্য মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে বিভিন্ন পরব গানের মধ্যেদিয়ে সামাজিক উৎসব পালন নিতান্তই স্বাভাবিক পল্লীগান বা লোকগানের উদাহরণ। বহু সমর্থিত এবং পারস্পরিক অলংকারিক বৈশিষ্ট পূর্ণ আলাদা আলাদা লোকগানের ধারা যখন পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয় কিংবা বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রচারিত হয়, তখন লোক-সমর্থিত পারম্পর্যই (কথা এবং সুরের) এই বিশিষ্ট গীতশৈলীর শাস্ত্র হিসাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রতিটি গীতশৈলীই আলাদা একটা ঢং বা রীতির। আপাতদৃষ্টিতে শুধুমাত্র গান হিসাবে মনে হলেও দীর্ঘদিনের চর্চা বা অনুশীলনে একটা স্বকীয়তা(Originality) গড়ে ওঠে। স্রষ্টা বা Composer - এর নিজস্ব শিল্পবোধ (Sense of Art) অবশ্য এর জন্য দায়ী। রবীন্দ্রসংগীত বা নজরুলগীতির কথাই ধরা যাক; আপন আপন বৈশিষ্টে দুটি গীতিশৈলীর স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট। একাধিক সার্থক সংগীত শিল্পীর (Performen & Trainer) উপস্থিতিও উপরোক্ত গীতিশৈলী দুটিকে জনপ্রিয় করেছে এবং সেই কারণে গানগুলিতে সঠিক অলংকরণ (Exact Improvisation) সম্পর্কে সম্যক ধারণার অবকাশ রয়েছে। তুলনায় একসময়ে চর্চিত দ্বিজেন্দ্রগীতি, অতুলপ্রসাদী বা রজনীকান্তের গানগুলি আধুনিক সময়ে কম গীত হয় এবং উপরোক্ত গীত তিনটি সম্ভবতঃ প্রচারের অভাবে আলংকারিক বৈশিষ্টের স্বাতন্ত্র্য সর্বতঃ রক্ষা করতে সমর্থ হয় না। কীর্তনের পদ (Lyric) যখন আখর সহযোগে বিভিন্ন অঙ্গ সহ বিস্তার লাভ করে, তখন তা শুধুমাত্র পদ বা প্রবন্ধ (Composition) থাকে না। লোকসংগীতের দায়রা ছেড়ে নানাভাবে পরিবর্ধিত এবং পরিমার্জিত রূপ বিশিষ্ট শাস্ত্রীয় সংগীতের এলাকাভুক্ত কীর্তন।

এবার রাগ সংগীতের ক্ষেত্রগুলিতে বিচরণ করা যাক। রাগ ভারতীয় সংগীতের আধার স্বরূপ(base)। উত্তর ভারতীয় দুটি গীতশৈলীর (form of music) মাধ্যমে রাগের সঠিক প্রকাশ(Exact interpretation) সম্ভব; যথা- ধ্রুব (Dhrupad) এবং খেয়াল্ (Khayal) টপ্পা, ঠুমরি ইত্যাদি গীতশৈলীগুলি ঘরানাদার দরবারি গায়কদের (Court musician) হাতে পড়ার আগে লোকসংগীতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলো। অনেকে গীতিগুলিকে 'Semi Classical' বলে আখ্যা দেন। কারণ এই গীতিগুলিতে রাগদারি প্রকাশের (Raga exposition) অবকাশ নেই - আছে বিস্তার সহযোগে ভাব প্রকাশের।

তাহলে উপরোক্ত আলোচনা থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারা যায় যে, সঠিক অলংকরণ(proper embellishment) প্রতিটি গীতশৈলীর স্বরূপ প্রদর্শনের পরাকাষ্ঠা। গান বা কন্ঠ সংগীতের (Vocal Music) প্রধান উপাদান হলো-

১) স্বরক্ষেপণ(articulation of sound)

২) শ্রুতি(microtone)

৩) অলংকরণ (যেমন মীড়, গমক ইত্যাদি নানা প্রকার

স্বরালংকার)

এবার শাস্ত্রে বর্ণিত পরিভাষাগুলির সঠিক প্রয়োগ সম্পর্কে বলছি। যেমন শাস্ত্রে গানক্রিয়াকে বর্ণ বলা হয়েছে; স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী এবং সঞ্চারী ভেদে বর্ণ চার প্রকার ইত্যাদি। একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে যে, গান সঞ্চারী বর্ণেই হয়ে থাকে। যেমন নির্দিষ্ট রাগের পকড় বা Phrase গুলির প্রকৃতি ক্ষেত্রে বিশেষে আরোহী (ascending), অবরোহী (descending) বা উভয়ই হয়ে থাকে। রাগের প্রকৃত স্বরূপ এভাবে জানা যাবে। সংগীতের উৎকর্ষের জন্য একজন প্রকৃত সংগীত শিল্পী তথা সংগীত শিক্ষককে সেই খোঁজই করতে হবে। রাগ-বর্গীকরণের কথাই ধরা যাক। জাতি, গ্রামরাগ, রাগ-রাগিণী, মেল-রাগ, রাগ-রাগাঙ্গ, ঠাট-রাগ প্রভৃতি বর্গীকরণগুলি শ্রাস্ত্রে বর্ণিত বিভিন্ন সময়কে সূচিত করে। জাতির দশ লক্ষণগুলি রাগে প্রযুক্ত হয় পরবর্তীকালে। আধুনিক যুগে কিন্তু রাগ লক্ষণগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ (Practical application) বদলেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও ঘরানাদার গুণীদের মধ্যে রাগ লক্ষণগুলির অনেকগুলি দেখা যেতো; যেমন, গ্রহস্বর অর্থাৎ যে স্বরে রাগটি শুরু হতো। আধুনিককালে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। অংশ স্বরকে অনেকে বাদীস্বর বলেন। বাদী-সম্বাদী-বিবাদী ইত্যাদি বৈশিষ্টগুলি পরবর্তীকালে সংগীতেরই বিবর্তিত রূপ বিশেষ। আজকের দিনে বাদী-সম্বাদী ইত্যাদি বিষয়গুলি ছাড়াও ন্যাস এবং স্বরসংগতির ব্যবহার সঙ্গত মনে হয়। ন্যাস বলতে রাগ যে স্বরগুলিতে বিশ্রান্তির অবকাশ আছে। আর স্বরসংগতিও- যেমন, কেদারে সা- ম; অথবা ভাটিয়ারে সা- ধ ইত্যাদি। কারণ স্বরসংগতিও রাগের স্বরূপ প্রকাশে একান্ত কার্যকরী, যা পকড়েরই নামান্তর।

সংগীত শুধু কলা (Art) নয়, ললিতকলার (Fine Arts) অন্তর্ভূক্ত। সংগীতের শাস্ত্র (Theory) থাকলেও তা হলো মূলতঃ ক্রিয়াত্মক শিল্প (Performing Art)। শিল্পী শিল্প সৃষ্টি করেন আর শিল্প রসিক বা শিল্প গ্রাহক (Receptor) শিল্পরস গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে শিল্পীর চাইতে শিল্প গ্রাহকের ভূমিকা কম নয়। শিল্প সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে গেলে সেই শিল্পের প্রতি অনুরাগ এবং মনসংযোগ একান্ত প্রয়োজন। এই নিরলস সাধনারই ফলশ্রুতি হলো শিল্পের মূল্যায়ন (Appreciation of Art)। সংগীতের ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য।

সংগীতের ঐতিহ্যের ধারা বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সাংবাদিক তথা সংগীত সমালোচকের সমাজতাত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি একান্ত প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি সংগীত গবেষকদেরও (Researcher) এগিয়ে আসতে হবে। সংগীতের বিবর্তনের ধারার সঠিক লিপিবদ্ধকরণই সংগীতের উৎকর্ষতার সহায়ক হতে পারে। সংগীতের সম্মেলনের(Conference\ Concert) পাশাপাশি সংগীত আলোচনাও (Seminar) থাকতে হবে এবং বর্তমান গানবাজনার সাথে সাযুজ্য রেখে শাস্ত্রের সেতুবন্ধন করতে হবে। পঃ ভাতখন্ডে এরকম সম্মেলন এবং আলোচনাসভা করেছেন। এরও বহু আগে গোয়ালিয়র অধিপতি মানসিং তোমর পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাঁর সভাগায়ক তথা সংগীতজ্ঞদের সহযোগিতায় ধ্রুপদের সুসংহত রূপদানে সমর্থ হয়েছিলেন। ফলস্বরূপ,একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছেও ক্রমহ্রাসমান ধ্রুপদ শৈলী সম্পূর্ণ অবয়বে প্রধানতঃ ডাগর ঘরানা এবং কিছু সংখ্যক সংগীত গুণীদের মধ্যে জীবিত। শিক্ষাঙ্গনগুলির (Institution) পাঠ্যসূচীতে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ধ্রুপদে আলাপ উপেক্ষিত থাকায় রাগের স্বরূপ প্রকাশের প্রধান অন্তরায়। শিক্ষককুলের এ বিষয়ে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গী সংগীতের উৎকর্ষ নিঃসন্দেহে বহুগুণে বাড়াবে।

সংগীতের উদ্দেশ্য সঠিক ভাবের প্রকাশ। শিল্পী মনের সঞ্জাত আবেগ প্রকাশিত হয় গানে। কিন্তু সে আবেগ বল্গাহীন নয়, আবেগের শৃঙ্খলাই সংগীতে সঠিক ভাব প্রকাশে সমর্থ হয়। সংগীতের ইতিহাস তথা শাস্ত্র বিস্মৃত হয়ে নয়, সংগীতে ভাবের প্রকাশ হোক ঐতিহ্যের হাত ধরে; সংগীতের নবজাগরণ হোক যুগে যুগে- আপামর সংগীত- সংস্কৃতিমনস্ক জনগণের ঐক্যবদ্ধ অঙ্গীকার ধ্বনিত হোক দিকে দিকে।

ভারতীয় বৃন্দবাদনের ইতিহাস ও ক্রমবিবর্তনের ধারা

■ সিদ্ধার্থ চৌধুরী

বৃন্দবাদন সম্বন্ধে জানতে গেলে পাশ্চাত্য বা ইউরোপদেশের কথা এসেই পরে। তাই ভারতীয় বৃন্দবাদনের ইতিহাস ও ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে জানতে গেলে পাশ্চাত্য বা ইউরোপ দেশের বৃন্দবাদনের কথা বাদ দিয়ে ভারতীয় বৃন্দবাদনের ইতিহাস জানা কোন ভাবেই সম্ভব নয়।

যিশু জন্মাবার প্রায় ৪০০ বছর আগেও ভারতে বৃন্দবাদনের প্রচলন ছিল। আধুনিক রীতিতে বৃন্দবাদন বা অর্কেস্ট্রা রচনার ভাবনা শুরু হয়েছিল প্রায় ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে। যতদূর জানা যায় তা শুরু হয় ভেনিসে। মধ্যযুগে ভারতীয় বৃন্দবাদনের কোন ইতিহাস নেই বললেই চলে। কারণ ভারতে পৃষ্ঠপোষকরা সিম্ফনী বা অর্কেস্ট্রাকে গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু সেই সময় পাশ্চাত্য বা ইউরোপ দেশে অর্কেস্ট্রার ব্যাপক প্রসার ও প্রচার ঘটতে শুরু করে। শুরুতে অর্কেস্ট্রায় মূলতঃ কাঠ ও পেতল সহ গঠিত বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হত। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দর প্রারম্ভে তারের বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার অর্কেষ্ট্রা গঠনের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ইতিহাসে দেখা যায় Montevrdi তার Orpheus(1607) গীতিনাট্যতে যে সকল তারের বাদ্যযন্ত্রের (String Instrument) বাবহার করেছিলেন তা হল ঃ-

Violin-10

Viola da gambas-3

Violin piccolos-2

Double basses-2

Harpsichords-2

Large lutc-2

Harp-1

সুষির বাদ্য (Wind Instrument) :-

Trombones-4

Trumpets-4

Small organs-3

Cornets-2

Flute-1

পরবর্তী সুরকাররা ছোট অর্কেস্ট্রা নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। Berlioz একবার Poten cial range of Tonal mishmash and effect এক অর্কেস্ট্রা গঠনের আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁর অর্কেস্ট্রা গঠিত হয়েছিল-

242 String Instrument

62 Wood Wind

47 Brasses

30 Harps

30 Grand Pianos

1 Organ

8 pairs of kettle drums

47 Percussion

360 choir singers

ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে অর্কেষ্ট্রা সম্বন্ধীয় অনেক তথ্য-র সন্ধান মেলে। প্রাচীন ভারতে অর্কেস্ট্রা ছিল গান ও নাটকের এক প্রয়োজনীয় অঙ্গ। সে যুগে এই কলার ব্যাপক চর্চা লোকমুখে প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগে ভারতের সংগীত জগতের এক উল্লেখযোগ্য নাম ভরত। তাঁর রচিত নাট্যশাস্ত্র তাঁকে অমর করে রেখেছে আজও। এই গ্রন্থটি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে রচিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়, যদিও এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। নাট্যশাস্ত্রের ২৮তম অধ্যায়ে বাদ্যযন্ত্রের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে অর্কেস্ট্রাকে "কুত্‌পবিন্যাস" বলে অভিহিত করা হয়েছে। অর্কেস্ট্রা ছিলো কঠোরভাবে পূর্ব পরিকল্পিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ। নাট্যশাস্ত্র রচয়িতা ভরতের মতে তিন ধরনের কুত্‌পবিন্যাস ছিল-

১) তত কুত্‌প String Instrument

২) আনদ্ধ কুত্‌প Wind Instrument

৩) নাট্য কুত্‌প Singing releated to the Drama

সে সময়ে ব্যবহার করা হতো এমন তত কুত্পের নাম হল বীনা, গোসোবতী,চিত্রা, বিপঞ্চী, পরিবাদিনী, বল্লকী, কিন্নরী, কুরমি, পিনাকী,আলাপনী ইত্যাদি। সুষির বাদ্যগুলি ছিল কাঠ ও ধাতু নির্মিত ফুত্কার সহযোগে বাজানো যায় এমন বাদ্য, যেমন- বাঁশি, পাবিক, মুহুরী, শৃঙ্গ ইত্যাদি। ড্রাম জাতীয় বাদ্যযন্ত্র ছিল-পনব, দর্দুর, ডক্কা, মানডিডক্কা, পটহ, ধক্কা এবং জাতীয় বাদ্য- জয়ঘন্টা, কম্সাতাল, কিরিকটদ ইত্যাদি।

ত্রয়োদশ শতকে শারঙ্গদেবের মতানুযায়ী অর্কেট্রাকে সম্মিলিত করতে কিছু নির্দেশ ব্যবহৃত হত। এই অর্কেস্ট্রাই পরে আলাদাভাবে গঠন করে বৃন্দ। বৃন্দ শব্দের উল্লেখ সংগীত রত্নাকর গ্রন্থে মেলে -যা প্রমাণ করে সে যুগে বৃন্দ বা সম্মেলক সংগীতের প্রচলন ছিল। বৃন্দ অবয়ব অনুযায়ী উত্তম (বড়), মধ্যম (সাধারণ) এবং কনিষ্ঠ (ছোট) এইভাবে বিভাজিত হত। এক্ষেত্রে বাদ্যকারের সংখ্যা থাকত পূর্বনির্ধারিত। কারোর পক্ষেই বাদ্যকারের সংখ্যা পরিবর্তনের কোন অধিকার ছিল না। তাঁরা জানতেন যে অতিরিক্ত বাদ্যকার বা বাদ্যযন্ত্রের সংযোজন অর্কেস্ট্রার চূড়ান্ত কলা বিন্যাসের বিরুদ্ধে যাবে। ফলে গান বা সুর হয়ে উঠবে শ্রুতিকটু। সেই মাত্রাধিক্যকে বলা হয় কোলাহলবৃন্দ। অর্কেস্ট্রার ক্ষেত্রে অবশ্যই বেশ কিছু নিয়ম ছিল যে শর্ত ও পদগুলি আদেশমূলক পালন করা হতো ।এই তথ্য-র ভিত্তিতে দেখা যায় অর্কেস্ট্রার নির্দেশ ও শর্তগুলি এর বিশুদ্ধতা ও অদ্বিতীয়তা বজায় রাখতে হত। কারণ সে যুগের মানুষেরা বিশ্বাস করতেন এই কলা হল চিরন্তন, তাই এর অন্তর্মুখী ঐতিহ্যকে রক্ষা করা উচিত। ত্রয়োদশ শতকের একটি আদর্শ অর্কেস্ট্রা মোটামুটি যা যা নিয়ে গঠিত হল, তা হল- চারজন প্রধান গায়ক, আটজন সহ গায়ক, বারোজন গায়ক। এদের সাথে থাকত চারজন বাঁশিবাদক, চারজন মৃদঙ্গবাদক ও আরো অনেক কিছু। প্রাচীন তথ্য অনুযায়ী জানা যায় ভারতীয়রা অর্কেস্ট্রা বিষয়ে অন্যদের তুলনায় অনেক এগিয়ে ছিল - প্রায় গ্রিসের সমান ছিল। পরে ধীরে ধীরে এই চর্চা অপ্রচলিত হয়ে পরে এবং সুরচর্চার এই পদ্ধতি একক সংগীত পরিবেশনে পরিণত হয়।

বৃন্দবাদন পদ্ধতি মধ্যযুগ পর্যন্ত প্রায় অবিকৃত ছিল। কিন্তু হিন্দু রাজত্বের অবসানে এবং ভারতে মুসলমানদের আগমনে, জনদরবার থেকে সংগীত যখন রাজদরবারের সীমায় বন্দী হল, তখন থেকে এই বৃন্দবাদনের অবক্ষয় ঘটতে থাকল। কারণ একক, দ্বৈত বা বৃন্দবাদন অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক বাদকই নিজ নিজ সংগীত সাধনার স্বতন্ত্র বাদক হিসাবে রাগাশ্রয়ী সংগীত প্রকাশে প্রয়াসী হয়ে উঠছিলেন। তুর্কি বা মুঘল ইতিহাস থেকে ভারতীয় বৃন্দবাদনের সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়না। আকবরের দরবারে তানসেন সমেত মোট বাইশজন সুরকার ও বাদ্যকার ছিলেন। কিন্তু তারা কখনই দলগত সুর পরিবেশনার জন্য একত্রিত হননি। এমনকি মহম্মদ শাহ রঙ্গীলা যিনি তাঁর রাজস্ব ভান্ডার উন্মুক্ত করে গান বাজনার জন্য অর্থ ব্যয় করেছিলেন; তা সত্তেও ঐকবাদনের জন্য কোন উৎসাহ পাওয়া যায়নি। পরবর্তী ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে বিভিন্ন কারণ বশত সুরকারেরা তাঁদের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য নিরাপত্তা হারাতে থাকেন। তাঁরা নতুন থেকে নতুনতর উৎসাহের খোঁজ করতে শুরু করেন। অবশেষে বেশিরভাগ সুরকার ও বাদ্যকার তাঁদের স্থানীয় রাজাদের কাছে এক এক করে আশ্রয়প্রাপ্ত হন, জন্ম নেয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ- উদ্ভব হয় ঘরানা প্রথার।

বাহাদুর শাহ জাফরের পতনের পর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ইউরোপিয় সংস্কৃতির হাত ধরে অর্কেস্ট্রার উৎসাহ ভারতে পুনরায় ফিরে আসে। এ বিষয়ে বেশ কতগুলি নথি প্রমাণ আছে। প্রিন্স দ্বারকনাথ ঠাকুরের কলকাতা ও ইংল্যান্ড- এ বেশ কিছু ইউরোপিয় অর্কেস্ট্রা উপভোগের অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি চৌরঙ্গী থিয়েটার কিনে নিয়েছিলেন, যা একসময় ব্রিটিশ কোম্পানি অধিকৃত বৃহৎ নাট্যশালা ও গীতিনাট্য মঞ্চ ছিল। এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে তিনি সম্ভবত এশিয়ার মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যিনি একটি বিশাল ব্যারেল অর্গান কিনেছিলেন এবং ইংল্যান্ডে যাবার সময় এটির দেখাশোনা করার জন্য এক জার্মান বাদ্যকারকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। সর্বপ্রথম সমবেত সংগীত শুরু করেন রাজা রামমোহন রায় তাঁর ব্রাহ্মসমাজে ।এই ধারণা পুরো সমাজে বিস্তৃতি লাভ করে। ঠাকুর পরিবার বিশেষতঃ ব্রাহ্মদের কর্তৃক সৃষ্ট সমবেত সংগীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, জনসমাজ কর্তৃক যা ব্যাপকভাবে গৃহিত হয়। এই জন আন্দোলন জন্ম দেয় সমবেত মতবাদের। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পিয়ানো বাজানোর মাধ্যমে পশ্চিমী বাঁশি বাদন রীতি এক ইউরোপিয়ানের কাছ থেকে শিখে নেন। তাঁর বড় ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও সঠিক পদ্ধতিতে পশ্চিমী ও ভারতীয় সুর শিখেছিলেন ও অর্কেষ্ট্রা সম্বন্ধে তাঁর একটা স্বচ্ছ ধারণা ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক ও অর্কেস্ট্রা দ্বারা প্রাচুর্য মন্ডিত ছিল। একই ভাবে ১৮৮২ সালে বাল্মীকি প্রতিভা নাটকও অর্কেস্ট্রা সহযোগে অত্যন্ত উন্নত হয়েছিল। এটি অনেক ইউরোপিয়ান কর্তৃক প্রশংসিত হয়। ঠাকুর পরিবারের অর্কেস্ট্রায় মূলতঃ পিয়ানো, অর্গান, ভায়োলিন, সেতার এবং বিভিন্ন ধরনের পার্কাসন ব্যবহৃত হত। ঠাকুর পরিবারের পাশাপাশি অন্য একটি পরিবারের এক্ষেত্রে নাম করতে হয়— তা হল পাথুরিয়াঘাটা পরিবার। এই পরিবারের সৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাম বিশ্বসুরের জগতে এক বিখ্যাত নাম। দক্ষিণাচরণ সেন(১৮৬০-১৯২৫) “ব্লু রিবন স্ট্রিং ব্যান্ড” নামে এক অর্কেস্ট্রার দল গড়ে তোলেন। ১৮৮৭ সালে তাঁর এই অর্কেস্ট্রা “ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রা” নামে বিখ্যাত হয়ে উঠে। জানা যায় পঞ্চম জর্জ এই অর্কেস্ট্রার ধারণ- পোষণ করতেন।

ভারতীয় রাগসংগীতের উৎস হল দেশীসংগীত। শিশিরকণা ধর চৌধুরী তাঁর একটি সেমিনারে এই সম্বন্ধে বলেছেন—“বৃন্দবাদনে এই দুই সংগীতই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত রাগসংগীতের সাথে বৃন্দবাদন বা অর্কেস্ট্রার কোনো সংঘাত নেই”। তাঁর এই কথার সূত্র ধরে বলা যায় যে দেখা গেছে বিশিষ্ট রচনাকারগণ বিশুদ্ধ রাগকে সমবেত যন্ত্রসংগীতের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তার প্রয়োগরীতি ভিন্ন। প্রাচীনকালের বৃন্দবাদনে বা অর্কেস্ট্রার সাথে বর্তমান কালের বৃন্দবাদন বা অর্কেস্ট্রার তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে শিশিরকণা ধর চৌধুরী বলেছেন “প্রাচীন যুগের বৃন্দবাদন পদ্ধতির সাথে বর্তমান কালের বৃন্দবাদন পদ্ধতির পার্থক্য রয়েছে প্রচুর। যুগের অগ্রগতিকে অস্বিকার করা যায়না, কারণ যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে মানব মনেরও ঘটে বিচিত্র পরিবর্তন, ধীরে ধীরে নব নব অভিব্যক্তিতে তার প্রকাশ”। প্রথমে ভারতীয় অর্কেস্ট্রার ক্ষেত্রে যে সংকীর্ণতা ছিল,

অনুশাসনের যে গন্ডিতে সে আবদ্ধ ছিল, ব্রিটিশ শাসনকালে তার বেশ কিছুটা মুক্তি ঘটে। ব্রিটিশ শাসনে শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষে প্রথমে 'ব্যান্ডকনসার্ট' কথাটির বহুল প্রচার ছিল এবং বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারে ও বাদন পদ্ধতিতেও অল্পবিস্তর পাশ্চাত্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

এর পরবর্তী সময়ে ভারতীয় বেতার কেন্দ্র অর্কেস্ট্রা গঠনের ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ নিবেশ করে। এর ফলস্বরূপ বেশ কয়েকটি অর্কেস্ট্রা গড়ে উঠে। এই সময়ে মুম্বাই বেতার কেন্দ্র ওয়াল্টার মেনকে দিয়ে অর্কেস্ট্রা তৈরী করে। সেখানে বিভিন্ন ভারতীয় রাগ দেশী ও বিদেশি যন্ত্রের ব্যবহারে আকর্ষণীয় হয়ে উঠে। বেঞ্জামিন ক্রেবেল, মান্তাস প্রভৃতি সংগীত পরিচালক ভারতীয় রাগকে বৃন্দবাদনের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ গুণীজনেরা বৃন্দবাদনের পক্ষে প্রথমে কোন উৎসাহ প্রকাশ করেননি। ধীরে ধীরে এই সংস্কার তাঁরা কাটিয়ে ওঠেন। ওই সময় বৃন্দবাদন গঠনের ক্ষেত্রে যার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব-যিনি গড়ে তোলেন "মাইহার ব্যান্ড"। তাঁর জীবনের সকল অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি এই ব্যান্ড। তাঁর প্রদর্শিত পথেই এগিয়ে গেছেন সুযোগ্য শিষ্য বিষ্ণুদাস, তিমিরবরণ,প. রবিশংকর ও টি কে জয়রাম প্রভৃতি।

এইভাবে ধীরে ধীরে ভারতে বৃন্দবাদনের একটি নির্দিষ্ট পথ আবিস্কৃত হল এবং জনপ্রিয়তাও অর্জন করল। ভারতীয় সংগীতের যে আধার Melody অর্থাৎ স্বর প্রকাশের ধারাবাহিকতা, তাকে কেন্দ্র করেই সংযোজন হল Harmony , Counter point.

বর্তমানকালে বৃন্দবাদনের ক্ষেত্র সীমিত নয়। এটি একটি স্বতন্ত্র ধারার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। আজকাল এই বৃন্দবাদন বা অর্কেস্ট্রা নিয়ে বেশ কিছু কাজ হচ্ছে—তবে সেগুলি যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয় সেদিকে সজাগ নজর রাখা উচিত।

তথ্যসূত্র ঃ

তিমিরবরণ-----পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি

রাগ-অনুরাগ-----প. রবিশংকর

সংগীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা মাসিক পত্রিকা

ভরত নাট্যশাস্ত্র- অনুঃ-ড.সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ড. ছন্দা চক্রবর্তী

রথীন্দ্র মঞ্চে শিশিরকণা ধর চৌধুরীর অর্কেস্ট্রা সম্বন্ধীয় একটি বক্তৃতা

"শাহেনশা-ই-গজল" ওস্তাদ মেহেদি হাসান খান
—একটি শ্রদ্ধার্ঘ

■ কল্পনা দে

সঙ্গীতকে কোনো দেশ কালের গন্ডী দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না। সুরের ধারা মেঘের মত সমস্ত গগন জুড়েই বেয়ে চলে। মেঘ যেমন আকাশ জুড়ে ইচ্ছেমতো ভেসে বেড়ায়, কোনো দেশের সীমানা বা কাঁটাতারের বেড়ার বাধা মানে না তেমনি গানের সুরও ভেসে বেড়ায় বাতাসে, দেশ-দেশান্তরে— তারপর শ্রাবণের ধারার মতো ঝরে পড়ে অঝোর ধারে। হাসি কান্নার ভাষা যেমন পৃথিবীর সবদেশে একই রকম, তেমনি সঙ্গীতকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করার ব্যাপারটাও সর্বদেশের সকল মানুষের কাছে একই রকম। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন 'আমি পৃথিবীর কবি' তেমনি অনেক গায়ক আছেন যাঁদের দেশের তুচ্ছ গন্ডীতে বেঁধে রাখা যায় না। তাঁরা সর্বপৃথিবীর। এমন ক্ষণজন্মা গায়কদের মধ্যে অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র গজল সাম্রাজ্যের বেতাজ বাদশা ওস্তাদ মেহেদি হাসান খান।

অবিভক্ত ভারতের রাজস্থানের লুনা গ্রামে ১৯২৭ সালে ১৮ই জুলাই এক সাঙ্গীতিক পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘকালের মার্গ সঙ্গীত ঐতিহ্যে লালিত কলাবন্ত ঘরানার ষোড়শতম প্রজন্মের প্রতিনিধি মেহেদি হাসান খান। তাঁর পিতা ছিলেন ধ্রুপদ ও খেয়াল শিল্পী ওস্তাদ আজিম খান এবং কাকাও ধ্রুপদ খেয়াল শিল্পী ওস্তাদ ইসমাইল খান। এই দুই দিকপাল ধ্রুপদ ওস্তাদের কাছে খুব অল্প বয়সেই মেহেদি হাসান তাঁর সঙ্গীতের প্রথম তালিম নিয়েছিলেন। মাত্র আট বৎসর বয়সে অবিভক্ত ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের ফাজিলকা বাংলায় বড়দাদার সঙ্গে প্রথম ধ্রুপদ এবং খেয়াল পরিবেশন করেন।

মেহেদি হাসানের জীবনটা সুখ ও সঙ্গীতের খেয়ায় ভেসে শুরু হলেও দেশভাগের বিভীষিকা তাঁর জীবনে অভিশাপ বয়ে আনে। মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সেই পরিবারের সঙ্গে দেশভাগের ফলে পাকিস্তানে চলে যেতে বাধ্য হন এবং সমগ্র পরিবারটি প্রচন্ড অর্থ সঙ্কটের মুখোমুখি হয়। চরম দারিদ্র্যের সম্মুখীন হওয়া পরিবারের হাল ধরলেন কুড়ি বছর বয়সী সদ্য কৈশোর পেরোনো মেহেদি। সাইকেলের দোকানে কর্মী হিসেবে যোগদান করেন। তারপর মোটরগাড়ী এবং ডিজেল ট্রাক্টার মেরামতি কর্মী হিসেবে কাজ করেন। দেশভাগের দুঃখ, অর্থনৈতিক বিপর্যয় বা কঠোর পরিশ্রমও তাঁর সঙ্গীতচর্চা বন্ধ করতে পারে নি। এমনই ছিল তাঁর সঙ্গীতের প্রতি নিবেদিত প্রাণ ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা। সময় বের করে তিনি নিয়মিত রেওয়াজ করেছেন। রেওয়াজের অভ্যাস ত্যাগ করেন নি বরং সঙ্গীত সাধনা তাঁর লড়াই-এ শক্তি জুগিয়েছে।

অতুলনীয় প্রতিভার অধিকারী হয়েও ভাগ্য-বিপাকে তাঁর একটু বেশি বয়সেই প্রতিভা বিকাশের সুযোগ ঘটেছিল। ১৯৫৭ সালে ৩০ বৎসর বয়সে প্রথম পাকিস্তান রেডিওতে গাইবার সুযোগ পান ঠুংরি গায়ক হিসেবে। রসিক শ্রোতারা তাঁকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেন। উর্দু কবিতা তিনি খুব ভালবাসতেন, উর্দু কবিতার প্রতি তাঁর অপ্রতিরোধ্য টানই তাঁকে গজল সাম্রাজ্যে পৌঁছে দেয়। তিনি ঠুংরি গানের পাশাপাশি আংশিকভাবে গজল গাইবার পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন। পাকিস্তান রেডিওর দুই শীর্ষ আধিকারিক জেড়, এ, বুখারি এবং রফিক আনোয়ারের পৃষ্ঠপোষকতায় মেহেদি হাসানের গজল গায়কী সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। শুরু হয় সমগ্র পৃথিবীর গজল শ্রোতাদের হৃদয় জয় করে নেবার পালা।

মেহেদি হাসান গজলকে নিজ প্রতিভার ছোঁয়ায় এক অন্যমাত্রা দিয়েছেন। তিনি গজল গানের গায়কীই বদলে দিয়েছেন। তাঁর নিজস্ব গায়কীতে গজল হয়ে উঠেছিল ঠুংরির বোন। খাম্বাজ, পিলু, দেশ ইত্যাদি মার্গ সঙ্গীতের জনপ্রিয় রাগই ছিল গজলের উৎস— সেই ধরনের গজলে গায়কের নিজস্বতা প্রয়োগের সুযোগ খুবই কম তাই মেহেদি তাঁর নিজস্ব স্টাইলে গানের কথা ও তার অন্তর্নিহিত মেজাজকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে গজলের গায়কী বদলে নিলেন। ধ্রুপদ খেয়াল ও রাজস্থানীয় লোকসঙ্গীতের মিশ্রণে সৃষ্ট মেহেদি হাসানের গজল শ্রোতারা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করলো। তাঁর প্রথম সুপারহিট গজল

"জিস্ নে মেরে দিল কো দর্দ দিয়া"

ক্রমে শ্রোতাদের হৃদয় মন জুড়ে অনুরণিত হতে লাগল তাঁর জাদুময় কণ্ঠের গজলের সুর—

"ওহ্ থকে থকে সে হোঁসলে"

"মোহব্বত করনেবালে কম না হোঙ্গে

"ম্যায় হোস মে থা তো ফির উস্‌সে মর গয়া ক্যাসে"

"দিল-এ-নাদান তুঝে হুয়া ক্যা হ্যায়" ইত্যাদি।

মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন ভারত ও পাকিস্তানের শ্রোতাদের তাঁর মনোহরণ কণ্ঠ দিয়ে। হয়ে উঠেছিলেন—

“শাহেন শা-ই-গজল”

মেহেদি হাসানের গানের সংখ্যা কুড়ি হাজারেরও বেশি। গজল এর পাশাপাশি সিনেমার গানেও তাঁর দৃপ্ত পদচারণা ছিল। তাঁর কয়েকটি বিশিষ্ট সিনেমার গানের কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। যেমন—

“শামা” সিনেমার—

১) “ইয়ে তেরা আনা ভিগি

২) “ও মেরি সোনালি সালোনী”

“সাবানা” সিনেমার—

১) “বেবাফা কৌন হ্যায়
তেরে সিবা”

২) “যো দর্দ মিলা আপনো সে”

“রাস্তে কা পাত্থর” সিনেমার—

১) “প্যার করনা তো এক”

২) “খুশবু কি হাওয়া মে”

“নজরানা” সিনেমার—

১) “ভিগি ভিগি রাতো মে”

“আপ কি খাতির” সিনেমার—

১) “আজনবী দেশ সে টুকরে হুঁয়ে” ইত্যাদি।

উর্দু ভাষা ছাড়াও মেহেদি হাসান বাংলা, পাঞ্জাবী ও পুস্ত ভাষাতেও গান গেয়েছেন। তাঁর গাওয়া বাংলা গান—

১) “ঢাকো যত না নয়ন দুহাতে”

২) “হারানো দিনের কথা” ইত্যাদি।

১৯৮০ সালের পর থেকে সিনেমার গান গাওয়া বন্ধ করে দেন শারীরিক অসুস্থতার জন্য।

মাত্র পঞ্চাশোর্ধ বয়স থেকেই শারীরিক অসুস্থতার জন্য ওস্তাদ মেহেদি হাসান খানের সঙ্গীতের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হতে থাকে। তাঁর গুণমুগ্ধ ভারতের সঙ্গীত সাম্রাজ্ঞী লতা মুঙ্গেশকর ওস্তাদজীর কণ্ঠস্বরকে “Voice of GOD” বলে অভিহিত করেছেন। লতাজীর সঙ্গে তাঁর প্রথম ও শেষ গানের রেকর্ড করা হয় ২০১০ সালের অক্টোবরে। “সরহুঁদে” নামের এই অ্যালবামটির “তেরেমিলনা”-র সুর করেছেন স্বয়ং মেহেদি হাসান এবং নগমা লিখেছেন ফারহাত শারজাদ। ২০০৯ সালে পাকিস্তানে মেহেদি হাসানের গানের অংশটুকু রেকর্ড করা হয়েছিল আর লতাজীর অংশটুকু মুম্বই-এ রেকর্ড করা হয়। তিনি ভারতে আসতে চেয়েছিলেন সুস্থ হবার জন্য। দেখা করতে চেয়েছিলেন দিলীপ কুমার, অমিতাভ বচ্চন, লতাজীর সঙ্গে কিন্তু তাঁর ইচ্ছা পূরণ হয় নি। ১৩ই জুন ২০১২ বুধবার করাচীর আগাখান হাসপাতালে ৮৪ বৎসর বয়সে “দুনিয়া-ই-মেহেফিল” থেকে চিরতরে বিদায় নিলেন গজল সম্রাট ওস্তাদ মেহেদি হাসান খান। রেখে গেলেন অগণিত গুণমুগ্ধ ভক্তদের।

তিনি অনেক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। পাকিস্তানের জেনারেল আইয়ুব খান তাঁকে “তংখা-ই-ইমতিয়াজ” পুরস্কারে সম্মানিত করেন। জেনারেল জিয়া-উল-হক তাঁকে “Pride of The Performence” এ ভূষিত করেন। জেনারেল পরভেজ মুশারফ তাঁকে ‘হিলাই-ই-ইমতিয়াজ’ পুরস্কারে সম্মানিত করেছেন। ভারতবর্ষের জলন্ধর তাঁকে ১৯৭৯ সালে “সেহেগ্‌ল” পুরস্কারে ভূষিত করে। ১৯৮৩ সালে নেপাল “গুর্খা দক্ষিনাবহু” সম্মান দেয়। মৃত্যুর আগেও তাঁর দুবাই গিয়ে একটি পুরস্কার গ্রহণ করার কথা ছিল।

জাদুকণ্ঠের অধিকারী ওস্তাদ মেহেদি হাসান আজ আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু আকাশে বাতাসে চিরদিন অনুরণিত হবে তাঁর হৃদয় নিঙ্‌ড়ানো গজলের সুর—তাঁর গান চোখের জলের শ্রাবণ ধারা হয়ে ঝরে পড়বে শ্রোতাদের মনের মাটিতে—

আব কে হম...........

“আব কে হম বিছড়ে তো শায়েদ কভি
খোঁয়াবো সে মিলে”

সংস্কৃতির আঙ্গিনায় ত্রিপুরা

■ ড. দেবব্রত দেবরায়

সংস্কৃতি সভ্যতার মতোই প্রবহমান। মানুষের চিন্তন মনন এবং জীবনধারার সঙ্গেই সংস্কৃতি নিবিড়ভাবে সংপৃক্ত। মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবন্ধনের অন্যতম উপাদান যেমন সংস্কৃতি, তেমনি সমাজ জীবনেরও একটি প্রধান আঙ্গিক সংস্কৃতি। সংস্কৃতি যেমন মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়, তেমনি বিকাশ ঘটায় রুচির। সংস্কৃতি ছাড়া মানুষের জীবন হয় অসম্পূর্ণ। দৈহিক বিকাশ এবং স্বাস্থ্যের জন্য যেমন সুষম খাদ্য অতি প্রয়োজনীয়, তেমনি মানুষের চিত্তের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন সংস্কৃতি। মানুষের জীবন ধারা এবং জীবনচর্যার মধ্যেই মিশে আছে সংস্কৃতি। সুপ্রাচীন কাল থেকেই মানুষের জীবন প্রবাহের মধ্যে এই সংস্কৃতি জীবন্ত হয়ে আছে। সংস্কৃতি মানুষকে উজ্জ্বল রাখে, প্রাণবন্ত করে তুলে। আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থা থেকে শুরু করে দাস সমাজ, সামন্ত ব্যবস্থা এমনকি পুঁজিবাদী সমাজেও এই সাংস্কৃতিক পরম্পরা এবং ঐতিহ্য বয়ে চলেছে। পৃথিবীর যে কোনো সমাজের মানুষের জীবন জীবিকার সঙ্গে সংস্কৃতি জড়িত হয়ে আছে ওতোপ্রতোভাবে। শুধু কৃষিভিত্তিক সমাজ নয়, যে কোনো সমাজ ব্যবস্থাতেই সংস্কৃতিচর্চা একটি জরুরি বিষয়। সংস্কৃতিচর্চা মানুষের মধ্যে শুভ চেতনাকে জাগ্রত করে। সংস্কৃতি যেমন আমাদের অতীত কৃষ্টি, সংস্কৃতি-এবং পরম্পরাকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরে তেমনি অতীতের সঙ্গে বর্তমানের একটা সেতুবন্ধ রচনা করে। এজন্যই বলা হয়ে থাকে যে, সংস্কৃতি মানুষকে সৃজনশীল, উৎপাদনশীল করে গড়ে তুলে। সংস্কৃতি ছাড়া মানুষের জীবন হয়ে উঠে যান্ত্রিক। নতুন প্রজন্মকে যদি আমরা তার কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং সভ্যতার প্রতি দায়বদ্ধ বা শ্রদ্ধাশীল করে তুলতে চাই তাহলে অবশ্যই সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের পরিচিত করে তোলা প্রয়োজন। তাদের মধ্যে যদি সাংস্কৃতিক চর্চার প্রচলন করা যায় তাহলে প্রকারান্তরে আমাদের সমাজ যেমন নান্দনিক হয়ে উঠতে পারে তেমনি নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের জীবনযাত্রাও রুচিশীল এবং পরিশীলিত হয়ে উঠে।

সংস্কৃতি কখনোই কোনো আবদ্ধ জলাশয়ের মতো নয়। সংস্কৃতি সবসময়ই সঞ্চালিত হয় এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে। সংস্কৃতি সঞ্চালনের মধ্য দিয়েই পরিপুষ্ট হয়ে উঠে আমাদের মানবসভ্যতা। সংস্কৃতি বিযুক্ত সভ্যতা কখনোই সমাজকে সমৃদ্ধ করে না। বরং সংস্কৃতিযুক্ত সভ্যতাই মানবসমাজকে উৎকর্ষতার উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। এজন্যই প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রয়োজন সাংস্কৃতিক চর্চা। সেজন্যই শ্রেনি সংগ্রাম, সামাজিক ন্যায় বিচারের সংগ্রামসহ শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিটি সংগ্রামেই সংস্কৃতি একটি শক্তিশালী উপাদান হিসেবে কাজ করে। সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্র এই শক্তিশালী মাধ্যমটিকেই সমৃদ্ধ এবং সংহত করার মহান ব্রত নিয়ে কাজ করে চলেছে নিবিড়ভাবে। অর্থাৎ সংস্কৃতি উপর থেকে চাপিয়ে দেয়ার কোনো বিষয় নয়। এ যেন আমাদের চেতনার মধ্যেই সুপ্ত হয়ে থাকে। তাকে জাগিয়ে তোলা, শানিত করাই হলো বড়ো কাজ।

এই প্রেক্ষাপটেই যদি আমরা ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার-নিয়ে ভাবনা চিন্তা করি তাহলে দেখবো ত্রিপুরার রাজন্য কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং গণতান্ত্রিক কৃষ্টি সংস্কৃতি যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে। ত্রিপুরার রাজন্য কৃষ্টি সংস্কৃতির মধ্যেই আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের উৎস নিহীত হয়ে আছে। তাই ত্রিপুরার রাজন্য সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের উৎস ও ধারার সন্ধান করা প্রায় অসম্ভবই বলা চলে। রাজন্য শাসনের নেতিবাচক দিকগুলোকে মাথায় রেখেই আমাদের এই কাজ করতে হবে অতি সন্তর্পনে। যে মহারাজার চারটি কাব্যগ্রন্থ থাকে, যিনি ভগ্নহৃদয় কাব্যগ্রন্থ পাঠ করে কাঁদতে থাকেন, এবং এই কাব্য গ্রন্থের স্রষ্টাকে খুঁজে বার করে তাঁকে ভবিষ্যতের 'কবি' হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পারেন, এমনকি কবিকে একলক্ষ টাকা দিয়ে একটি ছাপাখানা করে দেওয়ার মতো বিশাল হৃদয়ের পরিচয় দিতে পারেন, সেই মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যকে শুধুমাত্র রাজা বলেই এককথায় ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে দেওয়ার মতো ধৃষ্ঠতা আমরা কখনোই দেখাতে পারি না। কেননা ত্রিপুরায় ধ্রুপদী সংগীতের ধারা তো কাব্যরসিক, চিত্রকর এবং সংগীতপ্রেমী মহারাজা

বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময় থেকেই চলে আসছে।

তাঁর রাজসভাকে বিক্রমাদিত্যের রাজসভার সঙ্গে তুলনা করা হতো। সেই সভায় একদিকে যেমন ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতের একটা ধারা ছিল, তেমনি ছিল ইউরোপীয় সংগীতেরও প্রবেশাধিকার। তিনি উদার ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ ছিলেন বলেই তাঁর রাজ সভাতে ধ্রুপদী সংগীতের চর্চা যেমন হতো, তেমনি হতো বৈষ্ণব সাহিত্যের চর্চাও। বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতি এবং শ্রীহট্টীয় সংস্কৃতির একটা বড় প্রভাব ছিল সেখানে। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের রাজসভাতেই ছিলেন অন্যতম দুই সংগীত বোদ্ধা রাধারমন ঘোষ এবং মদন মোহন মিত্র। রাধারমন ঘোষের ছিল বৈষ্ণব সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য আর মদনমোহন মিত্র ছিলেন সংগীত ও কবিতায় অসাধারণ পন্ডিত ব্যক্তি। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের এই সংগীত পিপাসা এবং চর্চা সেদিন প্রভাব বিস্তার করেছিল বৃহত্তর বঙ্গভূমিতে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সংগীত গুরুর কাছে তালিম নিয়েছিলেন তাঁর কিশোর বয়সে, সেই পন্ডিত যদুভট্ট মহাশয় চারদিক আলো করে বসে বহুবছর সাধনা করেছেন বীরচন্দ্র মাণিক্যের রাজসভায়।

এই হলো ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের একটি খন্ডচিত্র। বীরচন্দ্র মাণিক্য আচার্য যদুভট্টকে তানরাজ উপাধিতে ভূষিত করে সমগ্র ত্রিপুরাকে সম্মানিত করেছেন। শুধু মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যই নন, তাঁর সুপুত্র মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের সময়েও রাজধানী আগরতলা মুখরিত থাকতো গ্রামবাংলার কীর্তন সংগীতে। সেই সময় তিন গুণী সংগীত সাধক রামধন শীল, রামকানাই শীল, এবং রাধাচরণ শীল এই রাজসভাকে মাতিয়ে রাখতেন। মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের সময়ে এই যে সংগীত চর্চা তা সঞ্চালিত হয় তাঁর পুত্র মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোরের সময়কালেও। মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর নিজেই ছিলেন একজন বড়ো মাপের শিল্পী। তাঁর সময়ে ত্রিপুরার রাজসভা যিনি আলো করেছিলেন তিনি ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব। যাঁর জন্মশতবর্ষ—আমরা উদ্‌যাপন করেছি সম্প্রতি। শুধু পরিণত বয়সেই নয়, আলাউদ্দিন খাঁ তাঁর পিতার ব্যান্ড পার্টির সঙ্গেও বহুবার ত্রিপুরার রাজবাড়িতে এসেছেন তাঁর যুবক বয়সে। শুধু আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবই নন, সেই সময় কাশেম আলি খাঁ সাহেবসহ বেনারস থেকে আসা বহু ধ্রুপদী সংগীত শিল্পী ত্রিপুরার সংগীতের ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন নানাভাবে।

সংস্কৃতির এই যে ধারা তাঁকে যদি আমরা আমাদের আলোচনায় না আনি তাহলে আমরা যথার্থ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের দাবি করবো কীভাবে? রাজন্য সংস্কৃতির এই ধারা পরবর্তীকালে যাঁর উপর বর্তায় তিনি ঠাকুর অনিলকৃষ্ণ দেববর্মণ। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌর ভাতখন্ড শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠারও চার বছর আগে ত্রিপুরাতে সঙ্গীতাচার্য অনিলকৃষ্ণের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল ধ্রুপদী সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ত্রিপুর ঐকতান বাদন সমিতি'। ত্রিপুরার রাজন্য সংস্কৃতির এইরকম অসাধারণ একটা সাংস্কৃতিক পরিবেশের জঠর থেকেই বিকশিত হয়েছিলেন কুমার শচীন দেববর্মণ। যিনি ত্রিপুরার মানুষের হৃদয়ের শচীনকর্তা। পরবর্তীকালে গোটা দেশ যাঁকে সুরসম্রাট বলে সম্মানিত করেছিল। তাঁর কণ্ঠ এবং সুরের যাদুতে মুগ্ধ হয়েছিলেন সমগ্র উপমহাদেশের সংগীতপ্রেমি মানুষ।

উত্তরাধিকারের এই ধারাই রাজতান্ত্রিক পরিবেশ থেকে গণতান্ত্রিক পরিবেশে প্রবাহিত হয়েছে। এর মধ্যে বিভাজন টানা হলেই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। সংগীতের এই ধারা বেয়ে যে সমস্ত গুণী সংগীত শিল্পী ত্রিপুরাকে সমৃদ্ধ করেছেন, বিশেষ করে ধ্রুপদী সংগীতে ত্রিপুরাকে একটা স্তরে উন্নীত করেছেন তাঁরা আমাদের কাছে পরম শ্রদ্ধার মানুষ। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন—পুলিন দেববর্মা, বারীন দেববর্মা, রবি নাগ, দৃষ্টিহীনশিল্পী সাধন ভট্টাচার্য, রঞ্জিত ঘোষ, শুভ্রা দাস, কণিকা চক্রবর্তী, ঝর্ণা দেববর্মণ প্রমুখ। যন্ত্র সংগীতে ত্রিপুরাকে যারা বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন সরোদে সুরেশকৃষ্ণ দেববর্মা, যিনি ঢাকার আকাশবাণীতে সরোদ বাজাতেন, লহরি দেববর্মা, অনাথবন্ধু দেববর্মা প্রমুখ। সেতারে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন হেমন্ত কিশোর দেববর্মা, উৎপল দেববর্মা, কালীকিংকর দেববর্মা প্রমুখ। রাজতন্ত্র থেকে গণতান্ত্রিক ত্রিপুরায় সংগীতের এই ধারা বেয়েই—ত্রিপুরার বর্তমান প্রজন্মের শিল্পীরা আজ রবীন্দ্র সংগীত, নজরুলগীতি, ধ্রুপদী সংগীত, লোকসংগীত ও গণসংগীতে ত্রিপুরার সম্মানকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে চলেছেন। যেমন রবীন্দ্রসংগীতে প্রয়াত সমীর দাস, তিথি দেববর্মণ, অভিজিৎ ভট্টাচার্য, সুব্রত দেবনাথ, দেবাশিস এন্দো, রীতা চক্রবর্তী, মধুরিমা ভট্টাচার্য প্রমুখ শিল্পীরা —ত্রিপুরার রবীন্দ্র সংগীতের জগৎকে সমৃদ্ধ করেছেন।

রবীন্দ্রসংগীতের পাশাপাশি নজরুল গীতিতেও বেশ কয়েকজন শিল্পী ত্রিপুরার সম্মানকে বৃদ্ধি করেছেন। যেমন—অমর ঘোষ, সুদীপ্ত শেখর মিশ্র, মায়া রায় স্বর্ণিমা রায়, মিতালি সেন, রুমা চক্রবর্তী, ঝুমা চক্রবর্তী প্রমুখ। আধুনিক সংগীতে শিবপ্রসাদ ধর, রঞ্জনা বরুয়া, অপর্ণা চৌধুরী, ডালিয়া দাস প্রমুখ শিল্পীরা যথেষ্ট অবদান রেখে চলেছেন। গণসংগীতে প্রয়াত হীরালাল সেনগুপ্ত, সমীর ধর এবং শচীনকর্তার গানে ফাল্গুন দেববর্মা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সংগীতের বিভিন্ন ধারায় বর্তমানে আরো বহু শিল্পী সুনামের সঙ্গে এবং কৃতিত্বের কাজ করে চলেছেন যারা সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের জগতে সার্থক উত্তরসুরী। লোকসংগীতের ক্ষেত্রে যে সমস্ত শিল্পী ত্রিপুরার সম্মানকে বৃদ্ধি করেছেন তাদের মধ্যে অমিয় দাস, শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, ড. উত্তম সাহা, নিরঞ্জন

অধিকারী, বলাকা দে, বাচ্চু পাল, প্রাণেশ সোম, শ্যামা নমঃ, রাজা হাসান, সুচরিতা ভৌমিক অন্যতম।

শুধু সংগীতেই যে এই উত্তরাধিকারের ধারা বহন করে চলেছে তাই নয়। নৃত্যের জগতেও আমরা দেখি যে রাজন্য সাংস্কৃতিক ধারাই—বর্তমান নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে প্রবহমান। অর্থাৎ নৃত্যের ক্ষেত্রেও বর্তমান বিকাশমান অবস্থার সন্ধান আমাদের করতে হবে ঐ রাজন্য সংস্কৃতির মধ্যে। এই প্রসঙ্গে আমরা প্রথমেই যে কথাটি বলবো তা হল—ত্রিপুরার রাজবাড়িতে নৃত্যের যে ধারা ছিল তা মূলত মণিপুরী নৃত্য। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্রিপুরার রাস উৎসবে পরিবেশিত মণিপুরী নৃত্য দেখে মুগ্ধ হয়ে এই নৃত্যকে অন্তর্ভুক্ত করেন শান্তিনিকেতনে। নৃত্যের ক্ষেত্রে প্রথমেই যে তিনজন নৃত্যগুরুর কথা উল্লেখ করতে চাই তাঁরা হলেন নবকান্ত সিং, বুদ্ধিমন্ত সিং, এবং নৃত্যগুরু নীলেশ্বর মুখার্জি। এই তিনজনকেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে নিয়ে গিয়েছিলেন মূলত আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নৃত্য শেখানোর জন্য। ত্রিপুরাতে নৃত্যের এই জগৎকে যাঁরা নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁরা হলেন—রাজকুমার চন্দ্রজিৎ সিং, সুরেন্দ্রজিৎ সিং, তম্বি সিং, বিহারী সিং, রুবি দত্ত, অনন্ত দেববর্মা, পূরবী চন্দ, মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, হীরা দে, পদ্মিনী চক্রবর্তী, উমাশংকর চক্রবর্তী, চিন্ময় দাস, অজন্তা বর্ধন রায়, মৌসুমী চ্যাটার্জি, শাস্বতী দেব, সোমা দত্ত, সর্বানী নন্দী, ববি চক্রবর্তী প্রমুখ। মণিপুরী নৃত্য ত্রিপুরার নৃত্যধারার উৎস হলেও বর্তমানে রবীন্দ্র নৃত্য, নজরুল নৃত্য, উড়িশি নৃত্য, ধ্রুপদী নৃত্য ইত্যাদিতেও ত্রিপুরার শিল্পীরা দক্ষতার পরিচয় রেখে চলেছেন। বিশেষ করে ধ্রুপদী নৃত্য হিসাবে ভরতনাট্যম এবং কত্থক নৃত্যের ধারাতো অব্যাহত রয়েছেই।

এই নৃত্যধারার পাশাপাশি রয়েছে আদিবাসী সমাজের অসাধারণ এবং আকর্ষণীয় নৃত্যধারা। আদিবাসী নৃত্যের মধ্যে ত্রিপুরার রিয়াং জনজাতি গোষ্ঠীর হজাগিরি নৃত্য ইতিমধ্যেই বিশ্বে বহু দেশের সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের মন জয় করে নিয়েছে। হজাগিরি নৃত্য ছাড়াও তাদের গড়িয়া নৃত্য, লেবাংবুমানি, মামিতা, বিজু নৃত্য, জুম নৃত্য, চেরো নৃত্য, ঝুমুর নৃত্য ইত্যাদি এই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ধারায় বয়ে চলেছে। ফলে এই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে আমাদের একদিকে যেমন সংরক্ষিত করতে হবে, তেমনি অন্যদিকে এই উত্তরাধিকারকে অত্যন্ত সার্থকভাবে নতুন প্রজন্মের হাতে তুলে দিতে হবে। যাতে নতুন প্রজন্ম অতীতের এই সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করতে শেখে, ভালোবাসতে শেখে। আর এই কাজটি যদি আমরা যথার্থভাবে করতে পারি তাহলে নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের ভোগবাদী সংস্কৃতি, পুঁজিবাদী এবং কর্পোরেট সংস্কৃতি গ্রাস করতে পারবে না। অন্যদিকে আমরা যদি আমাদের এই দীর্ঘদিনের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক উপাদান এবং ধারাকে সঠিকভাবে প্রবাহিত করতে না পারি তাহলে নেতিবাচক সংস্কৃতি তাদেরকে প্রলুব্ধ করতে পারে। এই ব্যাপারে আমাদের সবসময় সচেতন থাকতে হবে। আমাদের নতুন প্রজন্মের মনন এবং চিন্তনের জগতে যেভাবে নগ্নসংস্কৃতি, বিকৃত সংস্কৃতিকে জোর করে চাপিয়ে দেয়ার গভীর চক্রান্ত চলছে তার মোকাবিলা আমরা করতে পারি আমাদের বহু ঐতিহ্যমন্ডিত কৃষ্টি সংস্কৃতি ও পরম্পরা দিয়ে। আমাদের সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতি, আমাদের রবীন্দ্রসংস্কৃতি আমাদের বড় সম্পদ। এই সমস্ত সম্পদ একটি প্রজন্মকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা নিতে পারে। নগ্ন বা বিকৃত সংস্কৃতি সাময়িককালের জন্য মানুষকে বিপথে চালিত করতে পারে, বিভ্রান্ত করতে পারে, কিন্তু সবসময়ের জন্য করতে পারে না। তাই এক্ষেত্রে হতাশার কোনো সুযোগ নেই। কেননা মানুষ যেহেতু শেষ কথা বলে সেহেতু মানুষের সংস্কৃতিও শেষ কথা বলবে। তাই আদর্শে অবিচল থাকতে হবে।

ত্রিপুরায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা

■ সুদীপ্ত শেখর মিশ্র

উত্তর পূর্বাঞ্চলের এক ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরা, যেখানে রয়েছে এক অপূর্ব বনবীথিমন্ডিত পার্বত্য জনপদ। ভারতবর্ষের উত্তর পূর্ব প্রান্তের এ লাজুক অরণ্য দুহিতা তার নূপুর নিক্বণে ইতিহাসবেত্তাদের হৃদয়ে কোন বড়রকমের ঢেউ তোলে নি। এ রাঙা মাটির দেশে সবুজের হাতছানি, পাহাড়ী নদীর কলকল্লোল সরল গিরিবাসীদের হৃদয়ে সভ্যতার উন্মেষ লগ্ন থেকেই এক অপূর্ব জীবনবোধের সৃষ্টি করেছিল।

রাজন্য শাসিত ত্রিপুরায় যে সব রাজা রাজত্ব করে গেছেন তারা প্রত্যেকেই শিল্প-সাহিত্য- সংস্কৃতি চর্চায় কিছু না কিছু পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন। শুধু তাই নয় তারা কাব্য লিখেছেন, গান গেয়েছেন, ছবি এঁকেছেন, নাটক লিখেছেন।

প্রজাদের নৃত্য- সঙ্গীত শিক্ষার জন্যে সেই পঞ্চদশ শতাব্দীতেও আমরা দেখতে পাই রাজা ধন্যমানিক্য সুদূঢ় মিথিলা রাজ্য থেকে সঙ্গীতজ্ঞ ও নৃত্য শিল্পীদের ত্রিপুরায় নিয়ে এসেছিলেন। রাজমালায় উল্লেখ আছে-

> "ত্রিহুত দেশ হইতে নৃত্যগীত আণি
> রাজ্যেতে শিখায় গীতি নৃত্য নৃপমণি।।
> ত্রিপুর সকলে গীত সেই ক্রমে গায়
> ছাগ অন্তে (অস্ত্রে) তার যন্ত্রে ত্রিপুরে বাজায়।।"

ত্রিপুরা রাজাদের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে মহারাজ বীর বিক্রম ছিলেন অশেষ গুণ সম্পন্ন সঙ্গীতানুরাগী ও স্রষ্টা। হিন্দুস্থানী মার্গ সঙ্গীতে তার অসাধারণ প্রতিভার সাক্ষর পাই তার রচিত 'হোলি' গ্রন্থে-

> "চমকন লাগে তেরী বিন্দিয়া সেঁইয়া
> উড়তে অম্বর লালে বাদর,
> বিজুরী চমকে তেরী বিন্দিয়া, সেঁইয়া
> ঘটাঘন গজরত দফা ডাম্বর,
> বরখে বারি পিচকারী রাঙ্গিয়া, সেঁইয়া।"

সেতার ও এসরাজে পিতা বীরেন্দ্র কিশোরের মত তারও ছিল বিরাট দক্ষতা। গ্রামোফোন কোম্পানী তাঁর বাজনা রেকর্ড করেছিল কিন্তু শত অনুরোধেও তা বাজারে প্রকাশ করতে দেননি।

মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্য বাহাদুর ছিলেন সুগায়ক ও নানা ধরণের যন্ত্রবাদনে পারদর্শী। তাঁর রাজত্বকালেই ভারত শ্রেষ্ঠ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীরা এ রাজ্যে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে বিশ্রুত রবাব বাদক কাশেম আলী খাঁ, সুর-বীণ বাদক নিসার হোসেন, এসরাজ বাদক হাইদর খাঁ সেতার বাদক নবীন চাঁদ গোস্বামী, বেহালা বাদক হরিদাস, পাখোরাজ বাদক কেশব মিত্র, পঞ্চানন মিত্র ও রামকুমার বসাক, গায়ক ভোলানাথ চক্রবর্তী ও যদুনাথ ভট্ট প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। মহারাজ বীরচন্দ্র যদুভট্টকে তানরাজ উপাধিতে ভূষিত করেন। এইসব গাইয়ে বাজিয়েদের জন্য বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। সারা ভারতের সঙ্গীত শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতদের সমাবেশে ত্রিপুরার রাজ দরবার ছিল মুখরিত। রাজবাড়ীর অনুকরণে ও অনুসরণে রাজধানীর ঘরে ঘরে শুরু হয়ে যায় সঙ্গীতের চর্চা।

কুমার শচীন দেববর্মনের পিতা নবদ্বীপ দেববর্মণ রাজবাড়ীর পরিবেশে বড় হয়েছিলেন কিন্তু তিনি যুবরাজ না হতে পেরে আগরতলা ছেড়ে কুমিল্লা চলে যান। তাঁর ছিল অসাধারণ সঙ্গীত প্রতিভা। এই প্রতিভার স্পর্শেই আর এক প্রতিভার জন্ম হয়, যার নাম কুমার শচীন দেববর্মন। তিনি প্রথম পিতা নবদ্বীপ দেববর্মনের কাছে এবং পরে কৃষ্ণচন্দ্র দে, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় এবং বদ্‌লে খান প্রমুখদের কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম দেন।

শিল্পী অনিল কৃষ্ণ দেববর্মা ও সুরেশ কৃষ্ণ দেববর্মা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় ওস্তাদ আলাউদ্দীন খানের। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আকর্ষণে আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব বার বার ছুটে এসেছেন ত্রিপুরায়। অনিল কৃষ্ণ দেববর্মন যন্ত্র সঙ্গীতে বিশেষ পরাদর্শী ছিলেন। তিনি যন্ত্র তৈরীর কাজেও দক্ষ ছিলেন। উজীর বাড়ীকে কেন্দ্র করে তখন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রসার ঘটতে থাকে। বিশ্রুত শিল্পী পণ্ডিত পুলিন বিহারী দেববর্মনও এই উজীর বাড়ী থেকেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন। পরে অবশ্য তিনি লক্ষ্ণৌর মরিস কলেজে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে শিক্ষা লাভ করেন। এ রাজ্যে বিশিষ্ট ঠুমরী গায়ক ছিলেন রাজ্যেশ্বর বণিক। তবলায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন শচীন চক্রবর্তী । ত্রিপুরায় আরেকজন বিখ্যাত তবলিয়া ছিলেন কেষ্ট দাস। তিনি ওস্তাদ মজিদ খাঁর সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খানের সঙ্গে তবলা সঙ্গত করার সৌভাগ্য হয়েছিল শিল্পী কেষ্ট দাসের। এ রাজ্যে শাস্ত্রীর সঙ্গীতের চর্চায় হেমন্ত

কিশোর দেববর্মনের নাম স্মরণ করা যেতে পারে।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে সারা ত্রিপুরায় জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন পুলিন বিহারী দেববর্মা। এ রাজ্যের অনেক বিখ্যাত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের দিকপাল গায়ক-গায়িকা তার ছাত্র ছাত্রী। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় পন্ডিত রবি নাগের কথা। যিনি পরবর্তীকালে সারা ত্রিপুরায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। পুলিন দেববর্মনের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আরতি কর, সত্যেন দাস, রমেন্দ্রনাথ দে, রতন সেনগুপ্ত, তাপসী দত্ত, রুণা দেববর্মা, শুভ্রা দাস, কনিকা চক্রবর্তী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ওছাড়াও পুলিন দেববর্মনের কৃতী শিষ্য ছিলেন বারীণ দেব্বর্মন।

পন্ডিত রবি নাগের শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম শ্রদ্ধেয় রঞ্জিত ঘোষ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ধারাকে অক্ষুন্ন রাখতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন। এঁরা ছাড়াও শ্রী ননীগোপাল চক্রবর্তী, রাজেন্দ্র চন্দ্র দাস, বিনয় ভূষণ দেব, ভানু ধর, প্রমোদ দাস, অজয় ভট্টাচার্য্য প্রমুখেরা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসারে নিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ত্রিপুরায় একসময় অনিল সঙ্গীত বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে যন্ত্র সঙ্গীতে একঝাঁক শিল্পী উঠে আসেন-তাদের মধ্যে অশ্বিনী বিশ্বাস, যুগল কিশোর সরকার, তপন নন্দী, মানিক হালদার, উৎপল কৃষ্ণ দেববর্মা, অনাথবন্ধু দেববর্মা, শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য্য, এছাড়াও কালি কিঙ্কর দেববর্মা, ত্রিপুরেন্দ্র ভৌমিক, সুমেধা দেববর্মা, পরবর্তীকালে অলকেন্দ্র দেববর্মা, মৃণাল দেববর্মা, রবীন্দ্র দাস প্রমুখেরা তাদের সাধনার ফলশ্রুতি আমাদের কাছে অটুট রেখেছেন।

১৯৬৪ সালে সরকারী পরিচালনায় রাজ্যে সঙ্গীত শিক্ষার জন্য আগরতলায় সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মহাবিদ্যালয়ের গোড়াপত্তনে যাদের অবদান অনস্বীকার্য তারা হলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ, মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ জে.কে চৌধুরী, শিক্ষা অধিকর্তা জে. এন. চ্যাটার্জী, প্রধান শিক্ষক সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী এবং মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পুলিন বিহারী দেববর্মন। এই সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে যারা শিক্ষকতা করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাধন ভট্টাচার্য্য, আরতি কর, নারায়ণ দেববর্মন, তাপসী দত্ত, কনিকা দেববর্মন, ঝর্ণা দেববর্মন, শুভ্রা দাস, রবীন্দ্র দাস, অনাথবন্ধু দেববর্মন, উৎপল কৃষ্ণ দেববর্মন, বিহার রঞ্জন সিংহ, অনন্ত দেববর্মন, রতন সেনগুপ্ত, লহরী দেববর্মা, হীরণ দেববর্মন প্রমুখ। পূর্বসূরীদের অনুসরন করে ত্রিপুরাতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসার অনেকটাই বেড়ে গেছে। বেসরকারীভাবে বহু সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্র সৃষ্টি হয়েছে। সেখান থেকে প্রতিবছর বহু শিক্ষার্থী ভারতবর্ষের অনেক পরীক্ষা নিয়ামক সঙ্গীত সংস্থার অধীনে সঙ্গীত বিশারদ, সঙ্গীত প্রভাকর, সঙ্গীত ভূষণ, সঙ্গীত বিভাকর, সঙ্গীত নিপুন, প্রবীন ইত্যাদি ডিগ্রী ডিপ্লোমা নিচ্ছেন।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের যত্ন সহকারে অনেকেই প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন যারা নাকি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শিল্পী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নব প্রজন্মের শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ডঃ মৃণাল চক্রবর্তী, ভজন চক্রবর্তী, রাজীব চ্যাটার্জী, আশীষ চক্রবর্তী, উমাশঙ্কর চক্রবর্তী, হীরা দে, পদ্মিনী চক্রবর্তী, চিন্ময় দাস, শুভঙ্কর ঘোষ, বাবুল দেবনাথ, হীরন্ময় চক্রবর্তী, জহর ব্যানার্জী, সুবল বিশ্বাস, অশোক দাস প্রমুখ।

তবলা শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বীরেন রায়, মনোরঞ্জন দাস, পিনাকপানি গুপ্ত, গোপাল বিশ্বাস, মনোরঞ্জন দেব, তিমির রায়চৌধুরী, রথীন্দ্রনাথ রায়, দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য, হরেকৃষ্ণ রায়, নারায়ণ বিশ্বাস, অভিজিৎ কর, চিরদ্বীপ গাঙ্গুলী, প্রসেনজিৎ নন্দী, কপিল দেব, রথীন্দ্র ভূষণ, পঙ্কজ দাস প্রমুখ।

ত্রিপুরায় বহিঃরাজ্যের শিল্পীদের দিয়ে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান যারা করিয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সঙ্গীতচক্র, ত্রিপুরা স্টেট কলা একাডেমী , সুর ও বাণী, শনিবাসরীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ঘরোয়া সভা, ত্রিপুরা সরকারের তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর এবং শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স।

আনন্দের সংবাদ এই যে গত চৌদ্দ বছর ধরে শনিবাসরীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সংস্থা মাসের দ্বিতীয় শনিবারে স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করছেন। তাছাড়াও ত্রিপুরায় প্রতিটি ঘরে ঘরে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা হচ্ছে। এই চর্চার মূলকেন্দ্র বিন্দু হচ্ছেন আমাদের পূর্বসূরী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞগণ। তাই রাজ্যকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পীঠস্থান বলা যেতে পারে।

স্বপ্ল পরিসরে ত্রিপুরার শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পর্যালোচনা করা সম্ভব নয়। তাই অনবধানবশতঃ কোন গুণী ব্যক্তির নাম এ প্রবন্ধে অনুল্লেখিত থাকার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। পরিশেষে ত্রিপুরার গুণীসন্তান ও পরবর্তী জীবনে বাংলার প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ রাজ্যেশ্বর মিত্রের একটি মূল্যবান বক্তব্য উল্লেখ করে এ প্রবন্ধের ইতি টানছি।

“ আগরতলার সবচেয়ে বড় গৌরব তার সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য এখনো আমরা সেজন্য গৌরব অনুভব করি, কিন্তু সবই শ্রুতি, স্মৃতি। আগরতলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে আমরা ডকুমেন্ট দিয়ে পাকা করে রাখিনি। .... আগরতলায় কোন গোড়া মতবাদ ছিল না। ফলে নানা জাতীয় গাইয়ে, বাজিয়ে আগরতলায় এসেছেন।... গান বাজনা বোঝাবার মতো আশ্চর্য কান, সুরবোধ, তালবোধ, সেকালে আগরতলাবাসীদের অনেকেরই ছিল। .... আমার বন্ধুরা নেহাৎ অবসর বিনোদনের জন্যে যেরকম এস্রাজ বাজাতেন, তা বর্তমান রেডিওর অনেক আর্টিষ্টের ঈর্ষার বস্তু হতে পারে। তাঁদের বাজনা, নেহাৎ গতে সীমাবদ্ধ ছিল না, রীতিমত বড় বড় তানের কাজ তাঁরা এস্রাজে দেখাতেন। কলকাতায় সে ধরনের এস্রাজ বাজানোর প্রচলন নেই ...... ঠাকুর লোকদের অনেকেই তবলাও বাজাতেন চমৎকার। খুব আড়িতে গাওয়া গানের সঙ্গেও তাঁরা অবলীলাক্রমে তবলায় সঙ্গত করতেন। কলকাতায় বহুদিন বাস করে বাংলায় যে সংস্কৃতির পরিচয় পাইনি, আগরতলায় সেই পরিচয় পেয়েছি।” (সঙ্গীত কুশল আগরতলা ’ রাজ্যেশ্বর মিত্র, রবি নবপর্যায় আশ্বিন ১৩৬৮ বাংলা)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার-

১) পুর সংবাদ ১৯৯৮

২) স্মরণিকা- শনিবাসরীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ঘরোয়া সভা-১৯৯৯

৩) বিকচ চৌধুরী, ডঃ ব্রজগোপাল রায়, রাজীব চ্যাটার্জী

মঞ্চাভিনয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে অভিনেতার দায়িত্ব

■ পার্থ মজুমদার

নাটক সাধারণত দু'ধরনের হয়, একটি সম্পূর্ণ বিনোদনমূলক আর একটি বিভিন্ন সামাজিক বিষয়কে কেন্দ্র করে। যে বিষয়ভাবনাকে কেন্দ্র করেই নাটক রচিত হোক না কেন তার সফলতা তখনই আসে যখন মঞ্চাভিনয়ের মধ্য দিয়ে দর্শকদের কাছে পৌঁছায়। এবার নাটকটি নাট্যকারের ভাবনা ও নির্দেশকের পরিচালনা মেনে কিভাবে দর্শকদের সামনে পরিবেশিত হবে তা সম্পূর্ণই নির্ভর করে অংশগ্রহণকারী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের উপস্থাপনার উপর। তাই অবশ্যই আমরা বলতে পারি একটি নাটক সফল বা বিফল হওয়ার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রয়েছে পরিচালকের পাশাপাশি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের উপর। তাই যেকোন নাটকে অংশ নেওয়ার আগে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কিছু বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জন করে অংশ নেওয়াই সমুচিত। অভিনয়ের ভালোমন্দ সম্পর্কে একটা সাধারণ বোধ অনেকেরই থাকে। কিন্তু একজন অভিনয় শিক্ষার্থীর এ সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা থাকা দরকার।

কি ধরনের অভিনয়কে আমরা খারাপ বলি? যখন কোন অভিনেতার চোখ-মুখ কাঠের পুতুলে মত ভাবলেশহীন, হাবভাব জড়বৎ, হাত-পা নিয়ে কি করবে-কোথায় লুকোবে বুঝতে পারে না। ঘাবড়ে গিয়ে অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে, উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাত-পা নাড়ানো, অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর, তোতাপাখীর মত সংলাপ আওড়ে যাওয়া, পার্শ্ব-অভিনেতারা কি করছে সেদিকে খেয়াল না রাখা—এ সবই খারাপ অভিনয়ের পর্যায়ে পরে—আর এর ঠিক বিপরীতটাকেই আমরা বলি ভাল অভিনয়। তাহলে এখন স্বভাবতই প্রশ্ন আসে ভাল অভিনয়ের প্রাক্-শর্তগুলো কি?

মনোযোগ

আমরা জানি, আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মনোযোগ পরিবাহিত হয়, বাস্তব-এ আমাদের মনোযোগ স্বেচ্ছাধীন হতে পারে আবার ইচ্ছা নিরপেক্ষ হতে পারে কিন্তু মঞ্চে মনোযোগকে সর্বদাই সচেতনভাবে পরিচালিত করতে হয় এবং সবটাই স্বেচ্ছাধীন। মঞ্চে সব ঘটনাই পূর্বপরিকল্পিত—এমনকি আচমকা ঘটে যাওয়া বিষয়গুলিও থাকে পূর্বপরিকল্পিত কিন্তু অভিনয়ে পূর্বপরিকল্পনার প্রকাশ হওয়া কোনভাবেই বাঞ্ছনীয় নয়। তাই মঞ্চে অভিনয়ের প্রাক্শর্তই হল আমাদের মনোযোগকে নিয়ন্ত্রিত করার শক্তি অর্জন করা। অমনোযোগী অভিনেতা বা অভিনেত্রী কখনই ভাল অভিনয় দর্শকের সামনে উপস্থাপিত করতে পারে না।

পেশী সঞ্চালন

মনোযোগ-এর পরে যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত তা হল পেশীর সঞ্চালন। অনেক সময়ই দেখা যায় মনোযোগের অভাবে কিংবা মঞ্চভীতির কারণে আচ্ছন্ন হয়ে অনেক অভিনেতা/অভিনেত্রী বিব্রতকর হাবভাব প্রকাশ করে। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে জড়তা দেখা দেয়। বস্তুত এ হল পেশীর জড়তা। তাই কোন চরিত্র নির্মাণের জন্য শরীর নির্মাণ করা হল প্রাথমিক অন্যতম কর্তব্য—অর্থাৎ মুখ, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চোখ, কণ্ঠ এককথায় সমগ্র দেহযন্ত্র, যা মানুষ হিসেবে প্রত্যেকের আছে—সেগুলি প্রস্তুত করা অপরিহার্য। কোন অভিনেতার অভিনয় তখনই দর্শকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারে যখন সে— ক) নাট্যকারের তৈরী চরিত্রটির আবেগ-অনুভূতি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে; খ) উক্ত আবেগ অনুভূতি প্রকাশের উপযোগী দেহযন্ত্র প্রস্তুত করতে পারে; এবং সর্বোপরি গ) মনোযোগকে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়।

বাস্তব জীবনে আমরা যে কাজের জন্য যতটা প্রয়োজন ঠিক ততটাই শক্তি ব্যয় করি। সেখানে ব্যাপারটা স্বাভাবিক বা আমরা হিসেব করেও শক্তি ব্যয় করি না। কিন্তু যখন মঞ্চে অভিনয় করব তখনই অবশ্যই সেই শক্তিক্ষয় হিসেব করে করতে হবে—যেমন যদি একটি ৪০কেজি ওজনের চালের বস্তা উপরে তোলার অভিনয় করতে হয় তবে বাস্তবে ৪০কেজি ওজন আছে ধরে নিয়েই শক্তি ব্যয় করতে হবে—থাক্ না বস্তায় হাল্কা কাগজ ভর্তি। এই হিসেব ভিত্তিক শক্তিক্ষয় আমরা অভিনয়ের ক্ষেত্রে তখনই করতে পারব যখন আমরা পেশী সঞ্চালন মুক্ত ভাবে অর্থাৎ স্ব-নিয়ন্ত্রণাধীন করতে পারব। তাই বিশ্বাসযোগ্য অভিনয় করতে হলে পেশীর উপর নিয়ন্ত্রণ জরুরী।

যুক্তি

ভাল মঞ্চাভিনয়ের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যুক্তি। মঞ্চে আমাদের যে চরিত্রটি অভিনয় করতে হবে তাকে বাস্তবের সঙ্গে যুক্তি দিয়ে মিলিয়ে নিতে হবে। যেমন একটি ছোট্ট শিশুকে

উপরে তুলে দোল খাওয়ানোর অভিনয় করতে হবে—তখন বাস্তবে শিশুটিকে উপরে তোললে আমাদের হাত কতটা উপরে উঠবে—হাতের কোন্ অংশ বাঁকানো থাকবে বা হাতের কোন জায়গায় পেশী শক্ত হবে এই বিষয়গুলিকে যুক্তি দিয়ে মিলিয়ে নিয়ে তারপর অভিনয় করা জরুরী। আর তারজন্য যে বিষয়টা জরুরী তা-হল সৃজনশীল কল্পনা। কল্পনা না করতে পারলে অভিনেতা নয় কোন শিল্পীই সংশ্লিষ্ট শিল্পের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করতে পারে না। তাই চরিত্র-কে নাট্যকারের চিন্তা-ভাবনার প্রতি সম্পৃক্ত থেকে আপন কল্পনার মাধুরী দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হবে। কল্পনা-র ক্ষেত্রেও বিভিন্ন যুক্তির বিন্যাস জরুরী।

মঞ্চ মনোভাব

অভিনয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মঞ্চ মনোভাব। আমরা যখন অভিনয় করি বা দর্শক হিসেবে কোন অভিনয় দেখি তখন কিন্তু আমরা সবাই জানি মঞ্চের প্রতিটি বিষয় যেমন-সেট, পোশাক, আলো, আবহ এমনকি নিজের মেক্আপ করা চেহারা সবই কৃত্রিম। এই কৃত্রিমকে অকৃত্রিম রূপে গ্রহণ করা এবং দর্শককেও অকৃত্রিম ভাবাতে বাধ্য করা সম্ভব হয় মঞ্চ মনোভাব এর মধ্য দিয়ে। যেমন ধরি হাতে একটি জলের গ্লাস আছে তাকে ফুল ভাবতে বলা হল—তখন একজন অভিনেতা তার সৃজনশীল কল্পনা ও যুক্তির মাধ্যমে ভাবতে থাকা উচিত যে হাতে একটি ফুলই আছে। সে কি ফুল—তার বর্ণ কেমন—তার গন্ধ কেমন এইসব ফুল সম্পর্কিত যতবেশী বিষয় আমরা ভাবতে পারব ততই সহজ হবে মঞ্চ মনোভাব সঠিকভাবে তৈরী করা। অর্থাৎ দর্শকের কাছে যেভাবেই হোক ফুটিয়ে তুলতে হবে হাতের গ্লাসটা একটা ফুলই বটে— যে অভিনেতার মঞ্চমনোভাব যত বেশী positive সে তত ভাল অভিনয় দর্শককে উপহার দিতে পারবে।

মঞ্চে পারস্পরিক প্রভাব

মঞ্চে একটি চরিত্র অন্য চরিত্রের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে। নতুন অভিনেতাদের ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় যখন নিজের dialogue দিতে হয় তখন অভিনয় শুরু করে আর যখন dialogue থাকে না তখন সে অভিনয়ের বাইরে চলে যায়। খুবই বাজে দোষ। পাশের ভাল অভিনেতার অভিনয়ও তখন খারাপ হতে বাধ্য। মনে রাখা জরুরী যে, আমরা যতক্ষণ মঞ্চে আছি ততক্ষণই আমাদের অভিনয় আছে—সংলাপ থাকুক আর না থাকুক মনে রাখতে হবে অভিনয়ের ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেক অভিনেতা অভিনেত্রী প্রত্যেকের সাথে অবিচ্ছিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ তাই আমাদের সহ-অভিনেতা যখন অভিনয় করছে তখন অন্য অভিনেতাদের উচিৎ চরিত্র অনুযায়ী কি ধরনের শারীরিক ক্রিয়া অর্থাৎ মঞ্চক্রিয়া করা উচিত তা বাস্তবের সঙ্গে যুক্তি দিয়ে মিলিয়ে মহলার সময় অভ্যেস করা। নিজের মৌন অভিনয়ের মধ্য দিয়েও সহ-অভিনেতা/অভিনেত্রীকে ভাল অভিনয় করতে সাহায্য করা যায়—তাকেই আমরা বলি মঞ্চে পারস্পরিক প্রভাব।

সংলাপ ও ছায়া সংলাপ

ভাল অভিনয়ের আর একটি প্রাক্শর্ত হল সংলাপ মুখস্থ করে সঠিকভাবে পরিবেশন করা। চরিত্রের লিখিত কথাগুলিকে বলা হয় text বা সংলাপ আর যে উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলা হচ্ছে অর্থাৎ অন্তর্নিহিত অর্থ তাকে বলে subtext বা ছায়া সংলাপ। ভাল অভিনয় করতে হলে এই সংলাপ ও ছায়া-সংলাপকে নিজের কথা বলে গ্রহণ করতে হবে—এটা তখনই সম্ভব যখন 'কী বলছি', কেন বলছি'—এই দু'টো বিষয় পরিষ্কার হবে। এই দুটো বিষয় যত পরিষ্কার হবে ততই সংলাপের বিভিন্ন অংশের প্রকাশ, উঠা-নামা উচ্চারণ জীবন্ত হয়ে উঠবে। মঞ্চে পারস্পরিক প্রভাব বিস্তারে এটাও অন্যতম একটি উপায়।

সবশেষে একটা কথা বলতেই হয় অভিনয় কোন কারিগরী শিক্ষার মত বিষয় নয় যে পরিচালক বা নাট্য-একাডেমী বা নাটকের স্কুলে নির্দিষ্ট কোর্স করে শিখিয়ে দেবে। অভিনয় সম্পূর্ণ অভিনেতা/অভিনেত্রীর অনুভবের ব্যাপার। এই ক্ষেত্রে কোন পরিচালক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা উপরের লেখার বিষয়গুলো সাহায্য করতে পারে মাত্র। তবে অভিনয়ের ক্ষেত্রে আলোচিত বিভিন্ন বিষয়গুলো আয়ত্ব করতে কিছু সুনির্দিষ্ট অনুশীলনও আছে—যা নাকি ভাল মঞ্চশিল্পী হয়ে উঠতে সাহায্য করে, কিন্তু স্থান সংকুলনের জন্য অনুশীলন এর বিষয় আমার আলোচনায় স্থান পায়নি।

সূত্র ঃ

১। নিবন্ধ "The work of the actor"— আই র‍্যাপোর্পট

২। অভিনয় অভিনয় — নাট্য প্রয়োগকলা-১—গণমন প্রকাশন।

ভারতের জাতীয় সঙ্গীত ঃ প্রেক্ষাপট ও সঙ্কট

■ অলকানন্দা চৌধুরী

"জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা!
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণ মঙ্গল দায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে।"

আমরা আমাদের এই মহান জাতীয় সঙ্গীতের জন্য গর্বিত। আমরা গর্ব অনুভব করি আমাদের জাতীয় সঙ্গীত স্রষ্টা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্য। কারণ তাঁর রচিত দুটি গান দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীত রূপে গাওয়া হয়। তাঁর লেখা "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" গানটি আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। প্রতিটি মানুষের নিজ দেশের জাতীয় সঙ্গীতকে যেমন ভালবাসা ও সম্মান দেওয়া কর্তব্য তেমনি অন্য দেশের জাতীয় সঙ্গীতকেও সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া উচিত। যে কোনো জাতির গর্বের বিষয় তার দেশের জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত।

"জনগণ মন অধিনায়ক" গানটি রচিত হয়েছিল ১৯১১ সালে। শতবর্ষ অতিক্রান্ত এই গান আমাদের হৃদয়ের আসনে আজও সমুজ্জ্বল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করার পর সারাদেশে উঠলো প্রতিবাদের ঝড়, আন্দোলনের জোয়ার। সেই প্রতিরোধের কাছে নত হয়ে ১৯১১ সালে ইংরেজ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সে সময় ২৭শে ডিসেম্বর ১৯১১ কোলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হয়। সেখানেই কবিগুরুর লেখা এই গানটি প্রথম গাওয়া হয়। জনশ্রুতি সম্রাট পঞ্চম জর্জকে বন্দনা করেই গানটি লেখা হয়েছিল। ঘটনা পরম্পরায় এই সত্যটি গানটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিন্তু গানের স্রষ্টার অভিপ্রায় যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল তারই প্রমাণ পরবর্তী সময়ে এই গানটির জাতীয় সঙ্গীত রূপে স্বীকৃতি লাভ।

গানটি প্রথম যখন গাওয়া হলো তখনই একে ঘিরে কিছুটা বিতর্ক ছিল। 'দ্য স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার বিচারে এটি ছিল সম্রাট বন্দনা। অথচ বেঙ্গলি (বাঙালি সম্পাদিত পত্রিকা) কিন্তু একে জাতীয়তাবোধক গান বলেই উল্লেখ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বন্দেমাতরম্' গানটিকে জাতীয় সংগীত রূপে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু আপত্তি উঠেছিল। ১৯৩৭ সাল থেকেই এই বিতর্কের শুরু। বন্দেমাতরম্ গানের গভীরতা, ভাব, শব্দ সংযোজনা ও সুর খুবই অসাধারণ তবু কিছু সংকীর্ণ মানসিকতার কারণে গানটি নিয়ে আপত্তির মাত্রা বেড়েই চলে। 'বন্দেমাতরম্' শ্লোগান স্বদেশী আন্দোলনকারীদের বীজমন্ত্র হয়ে উঠেছিল। দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার কঠিন ব্রতে বিপ্লবীদের প্রেরণা স্বরূপ এই গানের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করার ক্ষেত্রে দেশবাসীও সচেতন ছিলেন।

এই দুটি গানের কোনটিকে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দেওয়া হবে এই বিতর্কের অবসান ঘটানোর জন্য কংগ্রেস এর পক্ষ থেকে একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। যার সদস্য ছিলেন পন্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু। শোনা যায় এ বিষয়ে তারা দুজনেই 'জনগণমন' গানটিকেই নির্বাচন করার পক্ষপাতী হন। ১৯৫০ সালের ২৪শে জানুয়ারী স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ কবিগুরু রচিত 'জনগণমন' গানটিকেই জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করার ঘোষণা দেন। সেই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের অমর সৃষ্টি 'বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতটিও জাতীয়তার মর্যাদায় ভূষিত হয়। এভাবেই দুটি গানই স্বাধীন ভারতের মানুষের কাছে শ্রদ্ধা ও সম্মানের ক্ষেত্রে মর্যাদা লাভ করে এবং দুটি গানই আজ অমরত্বের দাবীদার। ভারতের জাতীয় সংগীতের পরিচিতি লাভের পূর্বেই 'জনগণমন'

বিশ্বসমাজে পরিচিত হয় কারণ স্বয়ং নেতাজী এই গানটি আজাদ হিন্দ ফৌজএর সংগীত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

সম্রাট বন্দনার গান জাতীয় সংগীত রূপে গ্রহণ করা হয়েছে বলে এই গানকে নিয়েও যথেষ্ট অপপ্রচার হয়েছিল। এর অভিঘাত বিচলিত করেছিল স্বয়ং স্রষ্টা কবিগুরুকেও। এর উত্তরে তিনি 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি পত্রে লিখেছিলেন—"...তিনি জনগণের অন্তর্যামী পথ পরিচায়ক, সেই যুগ যুগান্তরের মানব ভাগ্য রথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা কোন জর্জ কোন ক্রমেই হতে পারেন না,"—এ থেকে স্পষ্টতই বোঝা গেল এর লক্ষ্য সম্রাট বন্দনা নয়। এখানে ধ্বনিত হয়েছে জাতীয় সংহতি, ঐক্য, স্বদেশচেতনা এবং সহমর্মিতার ঐকতান। এই প্রসঙ্গে আবার কবিগুরুর রচনা থেকে কটি কথা উল্লেখ না করে পারছি না। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—'প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করাই ভারতবর্ষের প্রধান বৈশিষ্ট্য। "এক কে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এক কে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা —নানা বাধা বিপত্তি-দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে।" —কবিগুরুর এই মতামত গভীর পর্যবেক্ষণ সঞ্জাত যার প্রতিফলন 'জনগণমন' গানটির মধ্যে স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান।

একবার স্বাধীনতা দিবসের আগে রেডিও-র একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য কিছু সাক্ষাৎকার নেওয়া প্রয়োজন হয়েছিল। ভারত এবং ভারতের স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে সাধারণ মানুষ কতটা ওয়াকিবহাল তার সমীক্ষা করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাকে মোটেই স্বস্তিদায়ক বলা যাবে না। একটি ঘটনার কথা লিখছি। আগরতলার বিবেকানন্দ পার্কে দুটি ছোট বাচ্চার হাত ধরে বেড়াতে আসা একজন ভদ্রমহিলার সাথে কথা হলো। উনি পেশায় প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষিকা। সাক্ষাৎকার নেওয়ার কথা বলতেই সানন্দে রাজী হলেন। আমাদের দেশে একটি জাতীয় সঙ্গীত এবং একটি জাতীয় স্তোত্র আছে সেগুলো কাদের রচনা এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি অকপটে বলেছেন— 'এখন তো এসব আর প্রয়োজনীয় নয় তাই এগুলোর চর্চাও নেই, মনে রাখারও দরকার নেই'। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় এরকম বেশ কিছু চমকপ্রদ উত্তর পাওয়া গিয়েছিল। একে কি অজ্ঞতা বলা যায় নাকি উদাসীনতা?

উদাসীনতার কারণেই হয়তো আমরা আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্য এবং তার উত্তরাধিকারকে প্রায় ভুলতে বসেছি। এই অপরাধ মোটেই লঘু নয়। অন্তত উত্তর প্রজন্মের কাছে সেই উত্তরাধিকারের সঠিক ও যথাযথ অর্পণ করার দায়িত্ব থেকে সরে থাকা অমার্জনীয় ত্রুটি বলেই গণ্য হবে। ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত, তার প্রেক্ষাপট ও রচনার পেছনে যে উজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে সেই বিষয়ে সচেতন থাকা প্রতিটি ভারতবাসীর প্রধান কর্তব্য।

যেখানে কথা ও সুরের সহযোগে ভাবের প্রকাশ— সেখানেই সঙ্গীতের উৎকর্ষ

■ সুতপা চৌধুরী

সাহিত্য কাব্যে, ধর্মে চিত্রে সমাজসেবায় দেশে একজন স্রষ্টা আসেন, যারা সর্বদাই তাঁদের পথে তাঁদের সমাজের আর সকলের চেয়ে অনেক এগিয়ে চলেন। সেই কারণেই সমাজ তাঁদের বা তাঁদের প্রচলিত পথ অনুসরণ করে নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যায়। এই হল জগতের নিয়ম। ছোট শিশু তার দাদাকে আদর্শ মনে করে। কী করে দাদার মতো হতে পারবে এই হল শিশুর একমাত্র ভাবনা। তেমনি দাদা ভাবছে কবে বাবার মতো বড়ো হয়ে চাকরি করে অর্থোপার্জন করবে। আবার বাবার কাছে আদর্শ মানুষ হল, যাঁর উপদেশে, বা যাঁর কার্যকলাপে তিনি অনুপ্রাণিত হচ্ছেন বা তাঁর জীবন পরিচালিত হচ্ছে তিনি। এর পরে ও যারা আরো বড়োকে অবলম্বন করতে চান তাঁরা ঈশ্বর বা 'ভগবান' নামে নানা রূপেগুণে ভূষিত এক কাল্পনিক শক্তির কাছে প্রেরণা সংগ্রহ করেন জীবনকে উন্নত করতে।

রবীন্দ্রনাথও নিজের জীবনে ভারতীয় সঙ্গীতকে অন্যান্য সাধকের মতোই উপলব্ধি করেছেন এবং তিনিও সেই আদর্শে গান রচনা করার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯১৫ সালে রবীন্দ্রনাথের 'দালিয়া' গল্পটিকে ইংরেজিতে নাটকাকারে লিখেছিলেন জর্জ ক্যালডেরন নামে একজন ইংরেজ। নাটকটির নাম দিয়েছিলেন The Maharani of Arakan, লন্ডনে ভারতীয়দের নিয়ে সেটি অভিনীত হয়। ১৯১৩ সালে গুরুদেব যখন লন্ডনে উপস্থিত ছিলেন, তখন তিনি এই নাটকের জন্য ইংরেজিতে তিনটি গান লিখে দেন। কিন্তু শোনা যায় নিজে সুর যোজনা করেছিলেন একটি মাত্র গানে। এই গানটির সুরে বিদেশী ঢঙের প্রাধান্য বেশী কিন্তু মাঝে দেশী সুরের আভাস স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

বিদেশী প্রথার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন দ্বারা গানে ভাব প্রকাশের সহজ রীতির প্রচলন আছে। সেখানে গলার স্বরের বিকৃতিকেই বড়ো করে দেখা হয়েছে সেই ধরনের গানে। আমাদের দেশের পদ্ধতি ঠিক তার উল্টো। ভারতীয় সঙ্গীত কোন দিনই ব্যক্তিগত জীবনের হাসিকান্নাকে অনুসরণ করেনি। কারণ এ গানের উৎস সাধকের সমহিত চিত্ত থেকে। আমাদের দেশের গাইয়েরা যখন গান করেন, তখন তারা চেষ্টা করেন না অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে গানের অর্থটিকে সুরে ফুটিয়ে তুলতে। তাদের কাজ হল গানের ভাবকে রাগরাগিণীর বিকাশের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা। কিন্তু বিলেতি সঙ্গীতে দেখাযায়, " হৃদয়াবেগের উত্থানপতনকে সুরের ও কণ্ঠস্বরের ঝোঁক দিয়ে খুব করে প্রত্যক্ষ করে দেবার চেষ্টা।" এই প্রথা ভারতীয় সঙ্গীতের পক্ষে উপযুক্ত নয়, তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, "দুঃখের গানে গায়ক যদি সেই অশ্রুপাতের এবং সুখের গানে হাস্যধ্বনির সহায়তা গ্রহণ করে তবে তাতে সঙ্গীতের সরস্বতীর অবমাননা করা হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই।" " সুরে ও কণ্ঠে জোর দিয়ে হৃদয়াবেগের নকল করতে গেলে সঙ্গীতের সেই গভীরতাকে বাধা দেওয়া হয়। সমুদ্রের জোয়ার ভাটার মতো সঙ্গীতের নিজের একটা ওঠানামা আছে কিন্তু সে তার নিজেরই জিনিস, কবিতার ছন্দের মতো সে তার সৌন্দর্য নৃত্যের পাদবিক্ষেপ ! তা আমাদের হৃদয়াবেগের পুতুলখেলা নয়।"

আর পাশাপাশি এই ভাবনাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ নিজে নৃত্যশিল্পী না হয়েও ভারতীয় নৃত্যকলায় এক নূতন যুগের সূচনা করেছিলেন। ভারতীয় নৃত্য গড়ে উঠেছিল গানকে ভিত্তি করে। রবীন্দ্র নৃত্যের মূল ভিত্তি গান। গানের যে অনির্বচনীয় ভাবকে সুরেও ঠিক ঠিক প্রকাশ করা যায় না, ছন্দোময় অঙ্গভঙ্গির ব্যঞ্জনায় তাকে আভাসিত করে তুলবার কাজে তিনি নৃত্যকে ব্যবহার করেছেন। তাই রবীন্দ্রনৃত্য হল 'ভাবনৃত্য'। সনাতন ভারতীয় নৃত্যকলার মতো রবীন্দ্রনৃত্যও একজাতীয় অভিনয় বিশেষ। বিলেতি নৃত্য হল যন্ত্র সঙ্গীত নির্ভর, দেহভঙ্গির সর্বস্ব অভিনয়, আর রবীন্দ্রনৃত্য হল উচ্চাঙ্গের ভাবাভিনয় যার ভিত্তি হল সঙ্গীতের ভাব ও ভাষা। নানা পদ্ধতির সুরের সুচারু মিশ্রণে গড়ে ওঠা রবীন্দ্র সঙ্গীত যেমন এক স্বতন্ত্র শৈলীর গান, নানা রীতি ও পদ্ধতির নৃত্যের সংমিশ্রণে রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছেন তেমনি স্বতন্ত্র নৃত্যধারা, যাকে বলা হয় রবীন্দ্রনৃত্য।

ঐতিহ্যবাহী শচীন দেববর্মন মেমোরিয়াল সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয় প্রসঙ্গে

■ জহর সূত্রধর

ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা যায় ত্রিপুরায় সংস্কৃতির চর্চা রাজ আমল থেকে প্রচলিত ছিল। মহারাজাদের অর্থানুকুল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের খ্যাতনামা শিল্পী পন্ডিতরা তাঁদের সংগীত চর্চার নিদর্শন উপহার দিয়েছেন রাজ আমলে, তার উল্লেখ আছে। সেই সময় রাজ সভায় যাঁরা সংগীত পরিবেশন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যদুভট্ট, কাশেম আলী খান, কোলান্ডর বক্স, হায়দর খান, নিসার হোসেন, পঞ্চানন মিত্র, কেশব চন্দ্র মিত্র, রাজকুমার বসাক, প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, মদন মোহন মিত্র, ব্রজ বিহারী দেববর্মন, মহারাজ কুমার নবদ্বীপ চন্দ্র, রনবীর কিশোর দেববর্মন, ঠাকুর অনিল কৃষ্ণ দেববর্মন, নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মন, হেমন্ত কিশোর দেববর্মন, বুদ্ধিমন্ত সিংহ, বসন্ত সিংহ, আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব, শচীন দেববর্মন, অমল কৃষ্ণ দেববর্মন, পুলিন দেববর্মন, নরেন্দ্র দেববর্মন, জ্যোতিষ দেববর্মন, কৃষ্ণজিত দেববর্মন, সুরেশ কৃষ্ণ দেববর্মন, মহারাজ রাধা কিশোর, মহারাজ বীরচন্দ্র, মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর, মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর এবং আরো অনেকে। দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্তের, 'সুরের ঝর্ণাতলা' প্রবন্ধে হোলী গানের চর্চার ও হদিশ পাওয়া যায় রাজ আমলে। এর পরবর্তী সময়ে রামচন্দ্র ঠাকুর, প্রসন্ন ঠাকুর, রামগোবিন্দ ঠাকুর, রামকানাই শীল, রামধন শীল, অমর চক্রবর্তী, সুবোধ দাস, সলিল নন্দী, বিধু ভট্টাচার্য, আদিম বক্স খান, চটি খান, কামারুদ্দিন খান, মহাদেব মিত্র, তারাপদ চক্রবর্তী এবং আরো অনেকের নাম ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক জগতে জড়িয়ে আছে। এছাড়া মহারাজ বীরচন্দ্র, মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর এবং মহারাজ বীর বিক্রম কিশোরের প্রচেষ্টায় প্রভুবাড়ীতে ঐতিহ্যপূর্ণ সংস্কৃতি চর্চার প্রচলন ছিল। তদুপরি রাজঅন্দরে মহারাজ কুমার ও মহারাণীদের সংগীত ও কাব্য চর্চার উল্লেখ পাওয়া যায়। যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহারাণী তুলসীবতী, মহারাণী প্রভাবতী দেবী, অনঙ্গমোহিনী দেবী, বিন্দু বাসিনী দেবী, ইন্দিরা দেবী, উজ্জলা দেবী এবং কমলাপ্রভা দেবী। এতে করে বুঝা যায় ত্রিপুরার সংস্কৃতির চর্চা, আনুগত্য ও পৃষ্ঠপোষকতা ভারতের ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখনীয় সেই সময়ের অর্থাৎ মহারাজ বীরবিক্রম কিশোরের রাজত্বকালে বালক পুলিন চন্দ্র দেববর্মনের সংগীতের প্রতি গভীর নিষ্ঠা, ভক্তি ও মনোযোগ দেখে তিনি রাজ অর্থানুকুল্যে সংগীত শিক্ষার জন্য তাঁকে লক্ষ্ণৌ পাঠিয়েছিলেন। মহারাজ ভেবেছিলেন ত্রিপুরার সংস্কৃতি জগতের উত্তর দায়িত্ব পুলিন চন্দ্র দেববর্মনই বহন করতে পারবে। হয়েছেও তাই। লক্ষ্ণৌ থেকে তিনি শাস্ত্রীয় সংগীতে 'বিশারদ' ডিগ্রি অর্জন করে সচেষ্টায় কৃষ্ণনগর নিজ বাড়ীতে সংগীত পিপাসুদের তৃষ্ণা নিবারণের নিমিত্তে গড়ে তুললেন সংগীত প্রতিষ্ঠান। যার নাম ছিলেন 'বীর বিক্রম বিদ্যালয়'। ত্রিপুরায় আজ শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রসার, অনুশীলন এর মূল ধারক ও বাহক পুলিন চন্দ্র দেববর্মন। পরবর্তী সময়ে সেই স্কুলটি তিনি স্থানান্তরিত করেন উমাকান্ত স্কুলের প্রাইমারী বিভাগে। যার নাম দিলেন "কলেজ অব মিউজিক এন্ড ফাইন আর্ট'। তারপর ১৯৬৪ সালের ১লা জুন পুলিন চন্দ্র দেববর্মন প্রতিষ্ঠিত সংগীত বিদ্যালয়টি রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করেছিলেন সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয় নামে IGM হাসপাতালের বিপরীতে। আবার রাজ্য সরকারেরই আন্তরিক প্রচেষ্টায় সেই সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয়টি পুনঃ নামাঙ্কিত হয়, 'শচীন দেববর্মন মেমোরিয়েল সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয়"। যার বর্তমান ঠিকানা লিচু বাগান। বৃহৎ পরিসরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ টিলার উপর মহাবিদ্যালয়টি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আজ সেই মহাবিদ্যালয় থেকে সংগীতে ডিগ্রি অর্জন করে ছাত্র/ছাত্রীরা ত্রিপুরার মুখ উজ্জ্বল করছে জাতীয় পর্যায়ে। নতুন মহাবিদ্যালয়টির উদ্বোধন সমারোহে উপস্থিত থেকে নিজেকে গর্বিত মনে হয়েছিল সেদিনটি ছিল ১৪ই আগষ্ট ২০০৯ইং। পরিশেষে বলতে হয় রাজ্য সরকার পুলিন চন্দ্র দেববর্মনের নিরলস সংগীত সাধনার ফলস্বরূপ 'পুলিন চন্দ্র দেববর্মন স্মৃতি নিখিল ত্রিপুরা উচ্চাংগ সংগীত প্রতিযোগিতা' প্রতি বছর সারা রাজ্যে অনুষ্ঠিত করে থাকেন যা অত্যন্ত গর্বের ও প্রশংসার দাবী রাখে। এই ধরনের প্রয়াসে উচ্চাংগ সংগীতের প্রতি সকলশ্রেণীর শিল্পীদের প্রেরণা ও উৎসাহ যোগাবে এবং আগামী প্রজন্মে শিল্পীদের সংগীত অনুশীলনের ক্ষেত্রে সহায়ক তথা জীবিকা নির্বাহের খোরাক যোগাবে।

সূত্র ঃ

১) সংগীতাচার্য পুলিন চন্দ্র দেববর্মনঃ স্মৃতির সরণি বেয়ে—পিনাক পানি গুপ্ত।

২) Indigenous Music and culture of Tripura- J.L. Sutradhar.

নৃত্যের কিছু কথা

■ অলকা দে

আমাদের দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভার এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিবেগ পরস্পরের মিলনে দেহ যখন লীলায়িত হয়, সৃষ্টির অভিপ্রায়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে দেহটাকে দেয় চলমান 'শিল্পরূপ'- তাকেই আমরা বলি নৃত্য। নৃত্যকলার মূল কথাই হল দেহের মাধ্যমে ভাবের অভিব্যক্তি। সুতরাং ভাবব্যঞ্জনাই নৃত্যকলার মূল কথা।

মানুষের সমাজে যত প্রকার শিল্পকলা জীবন্ত আছে তার মধ্যে নৃত্যকলা যে সবচেয়ে প্রাচীনতম তাতে কোন সন্দেহ নেই। সৃষ্টির যে বিচিত্র লীলা, অনাদি চাঞ্চল্য, অখণ্ড আবেগ তা সমস্ত কিছুই মিলে ছিল পাখীর দেহের ছন্দে। তারপর যে ধারা মানব দেহের আবর্তনে ছিল তা মানব শিশু থেকে শুরু করে গোটা মানব দেহের ছন্দে ফুটে উঠেছিল। প্রকৃতির সেই অঙ্গভেদীর প্রেরণা প্রকাশের মাধ্যমে উদ্ভব হয়েছিল "নৃত্যের "। তাই প্রাকযুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সেই ধারা সারা পৃথিবীতে প্রবহমান।

আদিম সমাজে আমরা দেখি যে, ব্যক্তি এবং সমাজকে দুর্বিপাক থেকে রক্ষা করতে ঐন্দ্রজালিক যাদুক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবে নৃত্যের উদ্ভব হয়েছিল। সভ্যতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নানা বৈচিত্র্য নিয়ে নৃত্য এক নতুন রূপ ধারণ করেছে। কারো মতে যৌন আকর্ষণ নৃত্যের উদ্ভবের একটি কারন। আবার কারো কারো মতে শস্য মানুষের জীবনে প্রধান তাই সুফল প্রাপ্তির পর আনন্দ উল্লাসে নৃত্যের উদ্ভব। আবার কারো মতে আদিম সমাজে শ্রমের ব্যবহার তার সঙ্গে দেহের অঙ্গ বিক্ষেপ যুক্ত ছিল। কেউ এমনও মত প্রকাশ করেন যে, আদিম মানুষ হাত পা নেড়ে যে অঙ্গ ভঙ্গী করত তাই হল নৃত্য। তাই নৃত্যের আরেক নাম হল " ইঙ্গিত কলা", তাই নৃত্যের গতি প্রকৃতি অকপট এইরূপ -

i) Tribal Dance > Quasi-Folk Dance > Folk Dance > Classico-Folk Dance > Classical Dance > New Classical Dance >Modern, Creative and Innovative Dance.

উক্ত ধারাবাহিকতায় দেখা গেল নাচের মধ্যমনি হল "লোকনৃত্য" এই লোকনৃত্যের ধারা থেকে একদিকে গেছে বা রয়েছে আদিবাসী নৃত্য এবং অন্যদিকে রয়েছে নব্য উচ্চাঙ্গ নৃত্য। সুতরাং দেখা গেল বৃহত্তর অর্থে লোকনৃত্যকে বলা যায় অতীত ও বর্তমানের সেতুবন্ধ স্বরূপ, একটি জীবন্ত উপাদান, এই লোকনৃত্যই হল নৃত্যের মুল ছন্দ। যাকে ধরে নৃত্য আজ নতুন পথে এগিয়ে চলেছে । আমি নৃত্যের ছাত্রী, তাই নৃত্য সম্বন্ধে যতটুকু জানি তার কিছু অংশ লেখার চেষ্টা করেছি।

The Musical Genius of Pt. Kumar Gandharva: An Introspective Study

■ Tripti Watwe

If we contemplate on the spiritual and philosophical character of a musical note, we find that every musical note merges in the Shunyata (eternal emptiness, a philosophical term which refers to the vastness of the cosmos) as soon as it is sung or created. Therefore, in a musical performance, be it a concert or a personal practice session in solitude, every moment an original music is created which is and has to be different from its predecessor. Herein lies the beauty of music. This metamorphosis of a musical note is similar to the journey of a river which merges itself in the vastness of the ocean and becomes part of the sea. In this onward journey of music, the bygone music tends to be forgotten in the wake of the original music that is about to take birth in a new moment. But history does have exceptions. If any music has managed to leave its fingerprints on the sands of time and has been able to leave its magnificence on the minds of its listeners, then one has to accept the musical genius of its creator. Here in this article an attempt has been made to explore the musical genius of the timeless maestro Pt. Kumar Gandharva, whose music left its lingering fragrance in the eternal passage of time.

Kumar Gandharva: The Wonder Child

Kumar Gandharva, or Shivputra Siddharammaya Komkalimath (8th April 1924- 12th Jan 1992) was born in Sulebhavi near Belgaum (Karnataka, India) to a Kannadiga family. He was a child prodigy and therefore was adorned with the title 'Kumar Gandharva', Gandharva means a celestial musical spirit in Hindu mythology.

This is a well-known fact that since his childhood, Kumarji had an exceptional caliber and that was to imitate maestros verbatim, after hearing them only once. In his pre-teen years, he was a concert hit for his amazing ability of imitating the greats like Abdul Karim Khan, Faiyaz Khan or Omkarnath Thakur. He cut his first records at a very young age. The great poet Vallathol recognized this child's immense talent and could foresee a future maestro in the child.

Brunt of Fate and Strength of Spirit

He studied music under the well-known Prof. B. R. Deodhar. He married Bhanumati Kans in April 1947 and moved to Dewas, Madhya Pradesh. Soon after moving there, he was stricken with lung cancer which was wrongly diagnosed as tuberculosis. He was forced into having a surgery to remove the cancerous lung or face eventual death by the disease. Kumar Gandharva opted for the surgery after much persuasion by his family and despite warnings that he might not be able to sing anymore. Recovering from the trauma of a surgery in Khanapur near Belgaum in Karnataka, Kumar Gandharva was visited by a fan who was also a physician. The doctor noted his surgical wounds had healed and asked Kumar Gandharva to attempt singing once again. Gradually, helped by this doctor, medicines of those yesteryears and care from Bhanumati Kans, Kumar Gandharva recovered and began singing again. However, his wonderful voice and singing style would always bear the scars of his surgery, which are evident to any person who listens to his songs such as 'Runanubandhachya" from the drama "Dev Dina Ghari Dhavla".

Bhanumati Kans, who was learning music first under Deodhar and later under Kumar Gandharva himself, nursed him through his illness. His first mehfil after recovery from illness took place in 1953. However during his illness too he is said to have religiously performed his riyaz mentally, exemplifying two facts, firstly that true dedication searches its way out even amidst dire problems, and secondly music need not have to be practiced every time with a tanpura rather riyaz can be also executed mentally, the later being much influential. The music that Kumar Gandharva rendered after his long illness was much more subtle and enriching as a result of his long contemplations on music during his illness. Rather his singing gave birth to a new style or thought of music.

Faith bears Fruit: The Novel Music of Kumar Gandharva

His singing was also true to the Indian classical music tradition of dialogue with the listeners, of impromptu creation and interactivity.

Kumarji also experimented with other forms of singing such as Nirguni bhajans (Devotional songs), folk songs, and with both ragas and presentation, often going from fast to slow compositions in the same raga, something rarely done by any other North Indian musician. He is remembered for his great legacy of innovation, questioning tradition without rejecting it wholesale, resulting in music in touch with the roots of Indian culture, especially the folk music of Madhya Pradesh. His innovative approach towards music led to the creation of many new ragas like Raga Madhusuraja, Raga Beehad Bhairav, Raga Nindiyari, Raga Saheli Todi, Raga Bhavmat Bhairav etc. to name a few.His singing in faster tempos, particularly his mastery over madhya-laya, was widely revered.

The Legacy Follows

Kumar Gandharva's first son, Mukul Shivaputra Komkalimath, was born around 1955. After Bhanumati's death in 1961 during childbirth, Kumar Gandharva married Vasundhara Shrikhande, another of his fellow-students at Deodhar School. Vasundhara Komkalimath formed a memorable duo with him in bhajan singing. She also provided vocal support to his classical renditions quite often. Their daughter Kalapini Komkalimath would later accompany both her parents on tanpura.

Some of Kumar Gandharva's ideology is carried forward by his son and daughter, as well as students such as Madhup Mudgal, Shubha Mudgal, Vijay Sardeshmukh and Satyasheel Deshpande. Kumarji's grandson Bhuvanesh (Mukul Shivaputra's son) has also made a name for himself as classical singer.

Raghava Menon in his book 'The Musical Journey of Kumar Gandharva' very aptly states that Kumar Gandharva split the Hindustani music into two halves- one before him and one after him- a kind of BC and AD in music!

The Philosophy of his Music

Kumar Gandharva had an all-inclusive vision about music. He believed that each and every thing in this universe can inspire a musician to create good, better and best of music, depending upon the capacity of the seeker of music. There is nothing in this cosmos from which music can't take insight for its evolvement. Therefore, he had a gamut of friends around him belonging to almost every discipline of the society and with whom he had regular conversations. He had engineers, architects, artists, sculptors, painters, writers, poets and of course musicians of all evolutionary stages as his close friends from whom he took inspiration for his music. This interactive nature of his, also consequently, made him an encyclopedia of knowledge.

His intensive introspection reflected in his music. His concepts on voice culture, voice production and musical improvisation are purely supported by logical facts and can work wonders if followed by the present generation of artists. Kumar ji believed that every musical note has an aura and to reach the centre of this aura must be the goal of every seeker of music and that an artist in his lifetime must endeavor to attain complete command over at least one musical note if not seven.

Kumar ji had his own profound theory on the methods of riyaz and the system of stage presentation. He held that unnecessary exhibition of 'Taan' sometimes destroys the subtle nature of a composition and therefore, it is not always necessary to sing 'Taan'in a recital of Hindustani Shastriya Sangeet. A person who has done sincere 'sadhana' of music, will never need the crutch of a 'Taan' to attract applaud from the audiences.

This maestro has become immortal in the hearts of his thousands of fans and many followers through his sheer commitment at the altar of music, and an uncompromising spirit to stand tall for the cause of pure music.

Kumar Gandharva was awarded the Padma Vibhushan award in 1990.

Reference

1. Kumar Gandharva- Mukkam Vashi (Book in Marathi), Compiled and Edited by Mo. V. Bhatavadeker, Mauj Prakashan Griha, Mumbai 1999

2. The Musical Journey of Kumar Gandharva, Raghava R. Menon, Vision Books

3. Wikipedia

Hindustani music and Rabindra sangeet

■ SHOUNAK RAY

Rabindranath Tagore's contributions to our cultural and literary field have greatly shaped our Bengali culture and society. Though Tagore is most popularly known to the world as a poet (viswakobi), his songs are also never to be forgotten. In his words " I get lost in my songs, and i think that these are my best work; i get quite intoxicated. I often feel that, if all my poetry is forgotten, my songs will live with my countrymen, and have a permanent place. i have very deep delight in them."

Tagore's musical thinking was deep and diverse. His musical world was pretty wide and his interest ranged from Scottish and Irish music to Bengal's regional and traditional folk music- Indian classical music being no exception to this. Tagore grew up listening to, learning and absorbing the dhrupad and khayal traditions from stalwarts like Bishnu Chakraborty, Jadu Bhatta, Radhika Prasad Goswami and others. Rabindranath's early training in music was deeply influenced by the Bishnupur Gharana.

During his childhood Joarashanko Thakurbari was the centre place of the Bramhosamaj and Tagore's father Maharshi Debendranath Tagore was as its centre stage. He inspired and motivated his children to compose songs for the Bramhosamaj. This encouraged young Tagore and his elder brothers and sisters to write more and more songs to gain their father's appreciation. While composing, they most often put lyrics to pre composed Hindustani classical tunes. Tagore's elder brother Jyotirindranath used to experiment with the traditional dhrupad and khayal compositions by playing them on his piano and composing new tunes, also encouraged young Tagore to compose lyrics to match such raga-based tunes. This was how 'Rabindrasangeet' took its early form. But later on, though Gurudev did not use any pre composed Hindustani tune, many of his compositions carried the essence of a particular raga or a mixture of ragas (mishra raga). The use of four parts (tuk) of a composition_sthayi, antara, sanchari and abhog by Tagore in most of his songs can also be attributed to Hindustani music as it is one of the main characteristics of the Dhrupad form.

Though he was influenced by many characteristics of Hindustani music, he never used alaps, vistars and some other basic characteristics of Indian classical music. In Hindustani music melody is of supreme importance and lyrics play a secondary role. But Tagore believed that both lyrics and melody play important roles in expressing the bhaav (emotion) of the song. So he bridged this gap. His music reached a high level of perfection in combining 'sur' (melody) and 'katha' (poetry) into an inseparable new entity, which became 'sangeet' (music).

Tagore composed his music with inherent simplicity and sincerity, the originality of his experiences and his spontaneity are close to the people : they do not appear strange to anyone and are in no need of defence.

Impact of YOGA on Dance

■ Smita Lahkar

The Sanskrit meaning of the word Yoga is 'Integration'. It represents a process through which one learns how to live life in the most integrated way. This becomes possible through the constant effort for identification and elimination of all the elements, which would lead to disintegration. The health of the body and mind being the most important components of this integrated state becomes an important concern in Yoga. Thus, Yoga, viewed at one level as a science of personal growth for spiritual experience can also be viewed at therapy level as a science of Health and Healing.

India has a great heritage of classical dance and music. Using the body as a medium of communication, dance is perhaps the most intricate and developed, yet easily understood art form.

The yoga and classical dance traditions of India have been inextricably entwined for millennia. It is believed that the sacred scriptures were handed down to us through expression, movement, and rhythm of dance; a dynamic form of Yoga (jyog) practiced by the ancient yogis and yoginis of the temples. The exacting hand gestures, postures and movements of Indian classical dance can only be achieved through yogic concentration. Conversely, the aesthetic, symmetry, and dynamism of dance enhance the practice of yoga. Both these two traditions are complementary and essential to one another.

Whether it is Break dance, Ballet, Indian Classical, Belly Dance, Tribal, Folk or Hawaiian, every dancer relies on flexibility, confidence and balancing of the body. Yoga is beneficial to all dancers for these reasons and many others such as strength, posture improvement, improved blood circulation, and purifying the body from toxins. Ashtanga Vinyasa Yoga or Power Yoga is a form of Hatha Yoga. It focuses on linking the postures with the breathing exercises into a flowing Yoga practice. Because of these unique capabilities of Ashtanga Yoga, it warms up the body before deep stretching to stretch more safely. In addition, stamina is created; this is beneficial to the dancer's body for overall performance endurance.

In Ashtanga Yoga, the first half of the practice is a warm up (Surya Namaskar) and standing asanas. The second half of the practice is a seated asana series and finishing sequence. The Sun Salutations are dynamic, getting the blood flowing, the heart rate up and using breath work to bring fresh oxygen to the blood improving circulation. The standing asanas are very beneficial for the dancer's body. They stress on balance, focus, strength, confidence, and equalizing/balancing both sides of the body. The seated asana sequence comprises many stretches for the hamstrings, hip openers, and core strengtheners. The seated

asana series postures are very therapeutic for the dancer working out any remaining stress, tension, and toxins from the body.

Some suggested Yoga poses for Dancers:

- Padangusthasana (Foot and Big Toe Posture & Hand to Foot Posture): This asana purifies toxins that collect in intestines and abdomen. This asana stretches the hamstrings and calves and is fantastic for all traveling steps such as camels and walking hip shimmy plus for footwork.

- Vrikshasana (Tree pose): This asana stretches the front and back of the dancer. It strengthens the quadriceps and spine, balances and tones up the spine. It also tones up the legs and feet. This Tree pose also works out for snake-like arm movements, arm stamina and spinal ripples and undulations.

- Utthita Trikonasana (Extended three-angle posture): This asana stretches the front and back of the dancer's legs. It strengthens the quadriceps also. In addition, it elongates the spine. It realigns one's skeletal system. Hip shimmies of all kinds can be achieved & improved with this asana.

- Prasarita Padottanasana (Spread leg/foot stretching postures): This asana stretches the low back, calves, and the chest. It also strengthens the quadriceps and hip flexors. The benefits are that the hamstring and abductor muscles are stretched while the dancer's head is below the heart.

One of the most precious gifts that Yoga offers is the mind/body experience. It brings clarity and peace to the mind of the dancers.

Benefits of Yoga for Dancers:

- Balance
- Clarity of the Mind
- Confidence
- Flexibility
- Improved Circulation
- Improved Lung Capacity
- Posture Improvement
- Purification of the Body
- Stamina
- Strength/Muscle Toning
- Stress Relief

Yoga, Meditation and Indian sacred dance are inseparable. This combined yoga and dance series offers a holistic practice that goes beyond technique and structure; and emphasizes the whole being; learning and practicing a philosophy of life in motion, in

Role of Media in Performing Arts

■ Sarita Banik

The word “media” is a common word to all of us. Media is basically a way through which we can easily get informations regarding any kind of things. By media, we mean newspaper, magazine, radio, television etc. The main purpose of media is to inform people about everything which is going on around us. The age of massmedia has brought to each man the awareness of things which were not in his scope of knowledge a few decade ago.

Media plays a Vital role in case of Performing arts. The media acts a link between the layman and the performer.Media basically informs the layman, when and where a good performer is going to perform and when the layman is often unsure, due to ignorance; it describes whether the performance was good or bad. The media in India has an extremely chequered history. It has two distinct factors government-controlled or influenced and anti-government or media Controlled by other influences. Recently, We have observed that there are some newspapers, magazines, Journals which are taking a professional and on the whole, unbiased approach to reporting.

In case of performing arts, we find that there are two types of listeners. They are basically-the connoisseur and the layman. The quantum in numbers and paying capacity of the connoisseur in contemporary materialistic environment is extremely limited. The second type of audience which is large in numbers, can contribute much more and is more susceptible to compromised forms of the arts due to this limited exposure.

Historically, we can distinguish two distinct periods : one is pre-independence period and another is post-independence period. The master-musicians of pre-independence period depended on the patronage and largesse of the discriminating rich and the powerful, including the rulers. Their need for public relations were nuch less because they never played for the masses. The principal reason for this were three, the first being that the economic difference between the rich and the poor was far greater than today, large gatherings of public in those artist considering the account rements necessary for him and his encourage. Single powerful richman could do that. They had the source and wherewithal. The second reason was that to really play to a large mass simultaneously, the electronic wizardly required for amplification and accoustics could be sustained only in smaller enclosed halls. Post-indepenedence India saw the beginnigs of changes. Due to gradually more equitable economic environment, better well-rounded education and the advancement of electronics, we started having a gradually broader based audience. In the process, the role of the media became to act as a contact route between the artist and the audience. This has placed a responsibility on the media, a resonsibility which, I am sad to say, has been grossly misused due to incompetence and egotism of the individuals involved in the reporting.

Now-a-days, everyone depends on mass-media. We connot think the world without media. Media is like a weapon which always focuses the truth and protects the mass-people. Media basically focusses the informations regarding the timings, patronages, places artists etc of performing arts.

But it is sorry to say that mass-media in India is still in its infancy. Before independence, all media was controlled by the Britishers. The legacy of the Britishers that is controlled or influenced media pretending to be independent seems to have pervaded our system till the next generation had taken over the reins of control of government at all levels.

But we always hope for the best. So, we feel that during the next few years, a sea of change is expected. We shall see our genuine artists being promoted by not only the government but also by the coming generation of media men, who we expect, will be unbiased and shall be forming opinions based on their our judgement. We are also optimistic about the fact that the journalistis of tomorrow shall be more professional and shall have an adequate sense of judgement to pursue an independent line which will encourage genuine talent in the performing art that is music and Dance in their various forms and the television shall pay due respect to musicians of India and thus shall take India culturally a step forward.

Classical Instrument of India SANTOOR

■ Suman Ghosh

Santoor is a very ancient instrument of India. The original name of this instrument was ‘‘ Shatatantri veena’’ which in sanskrit language means a veena of 100 strings. Today, when we say veena, it means a specific instrument but in ancient times veena was a common word for different kinds of string instruments. The first string instrument was called pinaki-veena. The idea to create this instrument came from the Bow and Arrow when Arrow was released it created a sound, out of that idea somebody created a musical instrument and named it pinaki- veena. ‘Pinak’ in sanskrit language means the Bow. In the western countries this instrument is called the ‘‘ Harp’’ and in India. we have got a miniature form of the same instrument known as “Swaamandal” which many vacalists these days use while singing. After pinaki veena in ancient India, we had different kinds of veenas like Baan Veena, katyani veena, Rudra veena, Saraswati Veena, Tumbru veena and shata-tantri veena.

In ancient Scriptures of India there is mention of shata-tantri veena which is known today as “Santoor”. This Instrument got its present name santoor with the persian language influence in our country . This instrument had been in use in the valley of Kashmir for many centries in a typical type of music Known as Sufiana maitsiqi” which means a music connected with sufi philosophy.

One interesting future about “Santoor” is that similar kind of instruments are found in different parts of the world with different names. Now “Santoor” is one of the best instrument of Indian classical music.

কিছু স্মৃতি কিছু কথা

■ ত্রিপুরেন্দ্র ভৌমিক

সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় আগরতলা, ১৯৬৪ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৫ ইং ১লা আগষ্ট থেকে ১৯৯৫ ইং ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। অর্থাৎ এই মহাবিদ্যালয়ের কৈশোর এবং যৌবন কালের সুখ-দুঃখ বা উন্নতি-অবনতির একজন সাথী ছিলাম আমি। এই ২০টি বছরের বহু স্মৃতি কথা মনের মণিকোঠায় চিরস্থায়ী ঠিকানা খুঁজে নিয়েছে। আমি যদি সাহিত্যিক হতাম, প্রাঞ্জল ভাষায় স্মৃতি কথাগুলি লিখতে পারতাম, একটা পূর্ণাঙ্গ পুস্তক-ই রচনা হয়ে যেতে পারতো। সব স্মৃতি কথা সর্ব-সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা যায় না—হয়তো প্রকাশ করা ঠিকও নয়। তাই কিছু কিছু নির্বাচিত স্মৃতিকথা পাঠক বর্গের অবগতির জন্য তুলে ধরার চেষ্টা করছি। Government Music College, Agartala (সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, আগরতলা) বর্তমানে যার নতুন নাম করণ Sachin Debbarman Memorial Government Music College (শচীন দেববর্মন স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়) ১৯৬৪ সনে বে-সরকারী সঙ্গীত সংস্থা 'College of Music and Fine Arts' কে অধিগ্রহণ করে প্রতিষ্ঠিত হয়। College of Music Fine and Arts সম্বন্ধে কিছু জানতে হলে আমাদের একটু পিছনের দিকে চলে যেতে হবে। স্বাধীনতার পর ত্রিপুরায় ধ্রুপদী সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে পুলিন দেববর্মন মহাশয় তার কিছু অনুগামীকে নিয়ে ১৯৫১ খ্রীঃ Music and Fine Arts নামে এক শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন নিজেদের সীমিত সামর্থ্য দিয়ে। তার পূর্বে সম্ভবতঃ ১৯৪৭ খ্রীঃ নিজ বাড়ীতে বীরবিক্রম সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরবর্তী সময়ে তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তা ড. জি এন চাটার্জির প্রেরণা এবং উপদেশ অনুসারে College of Music and Fine Arts এর জন্য সমিতি গঠন করা হয়। ঐ কমিটির সভাপতি ছিলেন M.B.B College -এর অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জে.কে. চৌধুরী মহাশয়। যিনি M.B.B College -এর রূপকার নামে খ্যাত এবং সম্পাদক ছিলেন উমাকান্ত স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়। যিনি ত্রিপুরায় প্রথম B.T. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক হওয়ায় B.T. মাষ্টার মহাশয় নামেই পরিচিত ছিলেন। এই তিন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগীর ছত্র-ছায়ায় পুলিন দেববর্মন মহাশয় সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানটিকে ক্রমশ জনপ্রিয় করে তুললেন। প্রসঙ্গত আমি সৌভাগ্যবান এই তিন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌কে স্কুলে এবং কলেজে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষক হিসাবে পেয়েছি এবং তাদের বিশেষ স্নেহ লাভ করেছিলাম।

১৯৫৭ সালে College of Music and Fine Arts ভাতখন্ডে সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ, লক্ষ্ণৌ এর অনুমোদন (affilesiation) লাভ করে। তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তা ড. জি এন্ চাটার্জি এই প্রতিষ্ঠানটির জন্য সামান্য কিছু সরকারী আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থাও করেন। প্রতি শিক্ষককে ৯০টাকা মাসোহারা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। ক্লাস করার জন্য উমাকান্ত স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের কয়েকটি ক্লাসরুম ছেড়ে দেওয়া হতো শনিবার বিকালে এবং রবিবার সারাদিন। ক্লাস হতো শনিবার বিকালে এবং রবিবার সকালে এবং বিকালে। ১৯৬২ সালে লক্ষ্ণৌ থেকে 'বিশারদ' পাশ করে ফেরার পর ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক College of Music and Fine Arts কে অধিগ্রহণ করার পূর্ব্বে ১৯৬৩ সনে আমিও কয়েক মাস ঐ বে-সরকারী কলেজে কাজ করেছিলাম।

College of Music & Fine Arts থেকে ভাতখন্ডে সঙ্গীত বিদ্যাপীঠের I.M.C. পরীক্ষা দেওয়ার পূর্ব্বে পুলিন দা আমাকে কয়েক মাস 'তালিম' দিয়েছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর রাজ খরচায় পুলিনদাকে লক্ষ্ণৌ পাঠিয়েছিলেন ভাতখন্ডে সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ থেকে "সঙ্গীত বিশারদ্" হওয়ার জন্য। পুলিনদার আশা ছিল বিশারদ্ পাশ করার পর তিনিও ঠাকুর অনিল কৃষ্ণ দেববর্মনের (সেতার শিল্পী) মত রাজ অনুগ্রহ লাভ করবেন। বিশারদ পাশ করে আগরতলায় ফিরে এসে মহারাজাকে একদিন গানও শোনান্। কিন্তু মহারাজ পুলিনদার জন্য কিছুই করেননি। শোনা যায় গান শুনে মহারাজ তেমন প্রসন্ন হননি। হয়তো যুবক পুলিন মহারাজার সামনে ভয়ে বা বেশী সতর্ক হতে গিয়ে ঠিক্‌মত গাইতে পারেননি হয়তো বা রাজদরবারে ভারত সেরা গায়ক-গায়িকাদের গান শুনে শুনে যুবক পুলিন দেববর্মনের গান ততটা ভাল লাগেনি। সে যাই হোক রাজ আনুকূল্যে পুলিনদার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হলো না।

অগত্যা বাঁচার তাগিদে রাজদরবারের সভাসদ্ প্রাক্তন মন্ত্রী ৺কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পিতা ৺হরিদাস ভট্টাচার্য্যের স্মরণাপন্ন হয়ে "ত্রিপুরা মডার্ন ব্যাঙ্ক"-এ (বর্তমান কংগ্রেস ভবন) করনিকের কাজে যোগদান করেন। কিছুকাল পর হরিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহায়তায় 'মডার্ণ' ব্যঙ্ক-এর কলিকাতা শাখায় transfer নিয়ে কলকাতা চলে যান—বড় ওস্তাদের কাছে আরো 'তালিম' নিয়ে বড় শিল্পী হওয়ার আশায়। কিন্তু কিছুকাল পর Modern Bank -এর পতন হয়। ফলে পুলিনদার আর কলিকাতায় থেকে বড় ওস্তাদের তালিম নিয়ে বিখ্যাত শিল্পী হওয়া হলো না। ফিরে এলেন আগরতলায়। নিজ বাড়ীতে প্রাইভেট শেখাতে লাগলেন। ১জন ২জন করে করে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়তে লাগলো। বাড়ীতেই সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "বীর বিক্রম সঙ্গীত বিদ্যালয়" গড়ে তুল্লেন। ক্রমশ তার উজ্জ্বল রূপান্তর হতে হতে আজকের 'শচীন দেববর্মন স্মৃতি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়"।

বর্তমানে ত্রিপুরায় স্কুল থেকে University পর্যন্ত সঙ্গীতের (কণ্ঠ, যন্ত্র, নৃত্য) একটা Academic System চালু রয়েছে। রয়েছে উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা, রয়েছে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো। তা ছাড়াও রয়েছে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ছোট ছোট অনেক সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এর ভিত্তি কিন্তু স্থাপন করে গেছেন পুলিনদা-ই। যদিও রাজন্য পরবর্তী যুগে ব্যক্তিগত উদ্যোগে আরো বেশ কয়েকটি সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছিল এবং ঐ সকল প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্বও কখনো অস্বীকার করা যাবে না। পুলিনদার গান শুনে মহারাজ যদি মোটা মাইনে দিয়ে পুলিনদাকে রাজদরবারের সভাগায়ক করে দিতেন তাহলে ত্রিপুরায় সঙ্গীতের বিশেষ করে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বর্তমান চিত্রটা কেমন হতো? উত্তরটা পাঠকদের উপর-ই ছেড়ে দিলাম।

১৯৬৪ সনে প্রতিষ্ঠিত সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় আগরতলা, ত্রিপুরা, সম্ভবত ভারতে প্রথম সম্পূর্ণভাবে কোন সরকার দ্বারা পরিচালিত সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়। সেই সময়ে ভারতে ভাতখন্ডে সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ অনুমোদিত সঙ্গীত কলেজগুলির মধ্যে আর কোন সরকার পরিচালিত সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় (College) ছিল না।

শিক্ষা অধিকর্তা জি.এন্. চাটার্জি (গোবিন্দ নারায়ণ চাটার্জি) মহোদয়ের ইচ্ছা ছিল কলেজের শুরুতে কলেজের Principal, Senior Lecturer এবং Lecturer post গুলি U.P.SC এর মাধ্যমে ত্রিপুরার বাইরে থেকে নিযুক্ত করা হবে। Instructor এবং Accompanist Post গুলি ত্রিপুরার শিল্পীদের মধ্য থেকে নিয়োগ করা হবে।

প্রথমে Principal নিয়োগ করা হলো যার সাধারণ শিক্ষার মান Undergraduate আমার পূর্ব পরিচিত, লক্ষ্ণৌ Postal Department-এ চাক্রী করতেন। তার পর ঐ সময়ে আগরতলা তথা ত্রিপুরায় গান-বাজনার ক্ষেত্রে যারা মোটামুটি পরিচিত ছিলেন তাদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক Instructor এবং Accompanist পদের জন্য Offer দেওয়া হলো। আমার দাবী ছিল Lacturer Post. আমাকেও Instructor পদের Offer দেওয়া হল। যখন দেখলাম কম যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি অধ্যক্ষ পদে নিযুক্তি পেয়েছেন আমাকে দেওয়া Offer ফেরৎ দিয়ে দিলাম। Senior এবং Junior শিল্পীর মধ্যে পার্থক্য না রেখে Offer দেওয়ার প্রতিবাদে লহরী দেববর্মনও (সরোদ) উনার Instructor পদের জন্য দেওয়া Offer ফেরৎ দিয়ে দেন। সবচাইতে খারাপ ঘটনা হলো ঐ সময়ে ত্রিপুরার Senior Most শিল্পী (এস্রাজ বাদক) নৃপেন্দ্র চন্দ্র দে'কে শিক্ষা অধিকর্তা জি.এন্. চাটার্জি ব্যক্তিগত আক্রোশ বশতঃ বিষয় শিক্ষক (এস্রাজ) পদের জন্য Accompanist পদের Offer দেওয়া। অকৃতদার নিঃসঙ্গ নৃপেন দে কে পুলিনদার অনুরোধে ঐ Offer মেনে নিতে হয়েছিল। কারণ পুলিনদার গানের সঙ্গে সব সময়-ই এস্রাজ বাজিয়ে সহযোগিতা করতেন নৃপেন দে।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে পুলিনদা'র অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ মহাশয়ের হস্তক্ষেপে পুলিনদা'কে Senior Lacturer (vocal) Post এ Ad-hoc appointment দেওয়া হয়েছিল। Recruitment Rules অনুযায়ী পুলিনদা'র Academic Qualification কম থাকায় Ad-hoc appointment কে regular করার চেষ্টা করেনি সরকার। ১৯৬৫ সনে U.P.S.C থেকে Senior Lacturer, Instrumental Music এর জন্য বিজ্ঞপ্তি জারী হলো। কোন বিশেষ বাদ্য-যন্ত্রের কথা বলা হয়নি উল্লেখ করা হলো "যে কোন বাদ্য-যন্ত্র"। আবেদন পত্র পাঠালাম দিল্লীতে Interview হলো। বে-সরকারীভাবে শুন্‌লাম আমি Selected হয়েছি কিন্তু সরকারের কাছ থেকে Offer পেলাম না। ৬ মাস পর সেই Interview-র বৈধতা থাকল না। পরবর্তী সময়ে U.P.S.C মারফৎ Sr. Lecturer Int. Music এর জন্য ডাকা হলো। এবার বাদ্য যন্ত্রের নাম উল্লেখ করা হলো "সেতার" অর্থাৎ Sr Lecturer, Instrumental Music এর জন্য একজন সেতার শিল্পী চাই। আমার বাদ্য-যন্ত্রের নাম 'বেহালা' তাই আবেদন করতে পারলাম না। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে বিস্তারিত জানালাম। সময় মত U.P.S.C Sr.Lecturer, Instrumental Music এর জন্য একজন সেতার শিল্পীর নাম Select করে ত্রিপুরা সরকারের নিকট পাঠালো কিন্তু ঐ Post -এ কেউ নিযুক্ত হলো না।

১৯৭২ সনে ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পেলো। Tripura Public Service Commission গঠিত হল। ১৯৭৩ সালের শেষ দিকে বা ১৯৭৪ সালের প্রথম দিকে Commission নিম্নলিখিত Post গুলির জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করলো—

1. Principal, Government Music College, Agartala, Tripura :-

1(one) Subject : Vocal

2. Sr. Lecturer, Instrumental Music, Govt. Music College, Agartala, Tripura :-

1 (one) Subject : sitar

3. Sr. Lecturer, Dance :- 1 (one)

এখানে apply করার কোন যোগ্যতাই নেই আমার। সেই সময় TPSC এর Chairman ছিলেন M.B.B College এর প্রাক্তন অধ্যাপক

তথা প্রাক্তন শিক্ষা অধিকর্তা Prof. I.K Roy মহোদয়। M.B.B College এ ছাত্রাবস্থায় উনাকে শিক্ষক হিসাবেও পেয়েছি। দেখা করে আমার বক্তব্য জানালাম। সব শুনে তিনি বল্লেন "Institution কর্তৃপক্ষ Institution" এর জন্য Subject Selection করতেই পারে। তখন আমার পাল্টা প্রশ্ন ছিল Principal Post এর জন্য কোন নির্দিষ্ট Subject (vocal) চাইতে পারে কিনা Principal of any General College এর জন্য M.A. Economics চাই M.A. English অথবা অন্য কোন Subject হলে চলবে না বল্‌তে বা চাইতে পারে কি-না? সব শুনে তিনি আমাকে বল্লেন—"তুমি Principal Post এর জন্য Apply কর । আমি তাই করলাম-যদিও আমি "রেয়াজ" করার স্বার্থে অধ্যাপক পদে-ই আবেদন করার পক্ষপাতী ছিলাম। 1st August, 1975 -এ সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে যোগদান করি।

আমি যখন সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে যোগদান করি সেই সময় শিক্ষা অধিকর্তা ছিলেন কর্ণাটক ক্যাডারের I.A.S. অধিপ চৌধুরী মহাশয়। তিনি খুবই সঙ্গীত ও সংস্কৃতি প্রিয় ছিলেন। তার নিজস্ব সংগ্রহশালায় সারা ভারতের বড় বড় সঙ্গীত গুণীদের Cassettee ও C.D.-র Collection রয়েছে, রয়েছে বিভিন্ন প্রকারের বাংলা গান ও বাংলা সিনেমার Collectionও। Music College এ তখন ভাতখণ্ডে সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ অনুমোদিত "বিশারদ" Courseএ কণ্ঠ সঙ্গীত, যন্ত্র-সঙ্গীত ও নৃত্য শেখানো হচ্ছে।

জানতে পারলাম College এ সঙ্গীতের Degree Course চালু করার চেষ্টা চল্‌ছে। শচীন বাবুর মুখ্যমন্ত্রীত্বের সময় বিশ্বভারতীর অনুমোদন নেওয়ার চেষ্টা হয় তিনি ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু বিশ্বভারতীর সংবিধানে এমন কোন সংস্থান না থাকায় তা সম্ভব হয়নি। তারপর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও অনুমোদন নেওয়ার চেষ্টা হয়। রবীন্দ্রভারতীর প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে আমি নিজেও খোঁজ-খবর নিতে রবীন্দ্রভারতীতে গিয়ে যোগাযোগ করেছিলাম। বিশ্বভারতীর মত একই কারণে রবীন্দ্রভারতীরও অনুমোদন পাওয়া যায়নি। শেষ চেষ্টা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের কাজ-কর্ম দেখাশোনা করতো Bengal Music College, ক্লাশও সেখানেই হতো। Affiliation এর ব্যাপারে কয়েকবার আমি সেখানে গিয়েছিলাম। শিক্ষা অধিকর্তা অধিপ চৌধুরীও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। অবশেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Pro-Vice Chancellar Prof. P.K. Bose ১৪ জনের এক Team নিয়ে আমাদের কলেজ পরিদর্শনে আসেন। ১৯৭৬-এ B. Music Degree Course এর জন্য Govt. Music College Agartala কে Affiliation দেয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভাতখণ্ডে সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ অনুমোদিত 'বিশারদ' Course এর সঙ্গে যুক্ত কোন কোন শিক্ষক-শিক্ষিকা এই Affiliation এর প্রচন্ড বিরোধিতা করে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু সরকার এই বিরোধিতায় কর্ণপাত করেনি। আজ সারা ভারতে বিশারদ কোর্স অবলুপ্তির পথে-ভাতখণ্ডে সঙ্গীত বিদ্যাপীঠের অস্তিত্বই বিপন্ন। নেই বল্‌লেই চলে। আজ সারা ভারতে সঙ্গীত শিক্ষা Academic System এর অন্তর্গত। প্রাথমিক স্কুল থেকে University পর্যন্ত সঙ্গীত শিক্ষা কার্যক্রম সমগ্র ভারতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ত্রিপুরায়ও চালু।

সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে আমার চাক্‌রী জীবনের আয়ুস্কালে কালে শিক্ষা মন্ত্রী হিসাবে দশরথ দেব'কেই বেশী সময় পেয়েছি। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় রাশভারি লোক, কম কথা বলেন—মনে হয় রস-কষহীন একটা লোক। আসলে কিন্তু তা নয়। মিউজিক কলেজের প্রায় অনুষ্ঠানেই তিনি উপস্থিত থেকে আমাদের উৎসাহিত করেছেন। বিশেষ কোন জরুরী কাজ না থাকলে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করে প্রত্যাখ্যাত হইনি। অনুষ্ঠান শুরুর আগে বা শেষে আমার ঘরে বসে অনেক গল্পও করেছেন। ছাত্রজীবনের কথা Communist Party'র কর্মী হিসাবে কৃচ্ছসাধনের কথা ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী ইত্যাদি। ক্রমশ উনার সঙ্গে একটা সহজ সম্পর্ক গড়ে ওঠেছিল আমার। প্রখর ব্যক্তিত্বপূর্ণ সহজ, সরল, শৃঙ্খলাপরায়ণ ব্যক্তি বলেই আমার মনে হয়েছে। একবার যা নিজের বিবেচনায় বুঝতেন্ বা অন্যের কথায় বিশ্বাস করতেন সেটাকেই ধরে রাখার চেষ্টা করতেন। নিজের সিদ্ধান্ত পরবর্তী সময়ে ভুল মনে হলে সংশোধন করতে চেষ্টা করতেন।

১৯৭৮-৭৯ সনে ভাতখণ্ডে সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ অনুমোদিত 'বিশারদ' কোর্সের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ Standing Recruitment Rules এর relaxation এবং Vacant Post-এ 100% Promotion এর জন্য দাবী নিয়ে সোচ্চার হলো। সরকারী কর্মচারী সমিতিও তাদের সমর্থনে এগিয়ে এল। শিক্ষা বিভাগ আমার মতামত জানতে চাইল। এই পরিস্থিতিতে আমি পরলাম মহামুশকিলে। যদি বলি 'Yes'-সরকারকে বিপথে চালানো হবে যদি বলি 'No' সহকর্মীরা অসন্তুষ্ট হবেন। শেষমেশ Institution -এর স্বার্থের দিকে তাকিয়ে সরকারকে সঠিক পথে নিয়ে যেতে আমি 'No' এর পথই বেছে নিয়েছিলাম। T.P.S.C 'র পরামর্শ চাইলে T.P.S.Cও একই মনোভাব পোষণ করল। শেষমেষ সরকার মন্ত্রীসভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে R/R পরিবর্তন করে অনেককেই Promotion দিল। কয়েক বছর পর সম্ভবত ১৯৮৬-৮৭ সন একদিন দশরথ বাবু আমাকে ডেকে বল্লেন "অনেক ছেলে-মেয়ে বাইরে থেকে সঙ্গীতে M.A. পাশ করে বসে আছে আমার কাছে চাকরীর জন্য আসছে Music College এর Vacant Post এ apply করতে পারছেনা কেন? আমি বল্লাম সরকারই তো Cabinet decision নিয়ে R/R change করে দিয়েছে। R/R অনুযায়ী Vacant Post এ 100% Promotion দিতে হবে Existing staffদের থেকেই। বাইরের Candidate কেউ apply করতে পারবে না। কিছুক্ষণ চুপ্ করে থেকে বললেন "আমাদের এই সিদ্ধান্তটা পুনর্বিবেচনা করতে হবে। Election এর পর মনে করাবেন তো?

অভিমানী শিক্ষক ঃ-

আমি যখন সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে যোগদান করি তার কয়েক বছর পূর্ব থেকেই আমার প্রথম সঙ্গীত গুরু, ত্রিপুরার বিখ্যাত সরোদ বাদক ৺লহরী দেববর্মন সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা

করছেন। ১৯৭৮-৭৯ সনে সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ যখন বিভিন্ন দাবী-দাওয়া নিয়ে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন সেই সময় একদিন লহরী দেববর্মন আমাকে এসে বল্‌লেন "সবাই তো প্রমশনের লাইগ্যা মন্ত্রীর কাছে দরবার কর্‌তাছে—আমি কমু টা কি?" শিক্ষামন্ত্রী দশরথ দেব এবং লহরী দেববর্মন দীর্ঘদিনের প্রতিবেশী একে অপরকে ভালভাবেই চেনেন্।

একদিন লহরী দেববর্মন শিক্ষা-মন্ত্রী দশরথ দেবে'র বাড়ী গেলেন, বৈঠকখানা ঘরে বস্‌লেন। একটু পরেই দশরথ বাবু ঘরে ঢুক্‌লেন লহরী দেববর্মনকে দেখে বলে ওঠ্‌লেন "কি ঠাকুর সাব্ কেমন আছেন? কেরে আইছেন্" বলে ইনিও বস্‌লেন। লহরী দেববর্মন বল্‌লেন—"সবেই দেখি প্রমোশনের লাইগ্যা দরবার কর্‌তাছে—তাই আপ্‌নের লগে দেখা করতে আইলাম্।" প্রতি উত্তরে দশরথবাবু বল্‌লেন---"অ! শরীর-টরির ভাল আছে তো? রেয়াজ-টেয়াজ করেন তো?" দশরথ বাবু'র এই কথা শুনার সঙ্গে সঙ্গে লহরী দেববর্মন—"কি কইলেন?" বলে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং ঘর থেকে বেড়িয়ে যেতে লাগ্‌লেন। দশরথ বাবু পিছন থেকে ডাকতে লাগ্‌লেন—"আরে কি অইল—আপ্‌নে দেখি রাইগ্যা গেলেন।" লহরী দেববর্মন পিছনে না তাকিয়েই বল্‌লেন—"আপ্‌নার কাছে প্রাণ থাক্‌তে আর কোন দিন আইতাম্ না" বল্‌তে বল্‌তে চলে গেলেন।

সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের আর একজন শিক্ষক "এস্‌রাজ" বাদক নৃপেন্দ্র চন্দ্র দে। রাজ-আমলের শিল্পী-বয়সে আমার থেকে অনেক বড়, শিল্পী হিসাবেও বড়। উস্তাদ্‌জী বলে সম্বোধন করতাম্ নববর্ষ বা বিজয়ায় 'পা' ছুঁয়ে প্রণাম করতাম। সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপরার মহামান্য রাজ্যপাল মহোদয়। আমি তখনও Music College-এ যোগদান করিনি। রাজ্যপাল আসবেন তাই time বাধা Programme প্রতিটি মিনিটের হিসাব কষে প্রোগ্রাম হবে— অংশগ্রহণকারী সব শিল্পীকেই বলে দেওয়া হয়েছে। তবু বয়স্ক বলে পুলিন দা Green Room এ মনে করিয়ে দিলেন "নৃপেন ভাই short কইরা বাজাইও সময়টা খেয়াল রাইখ্য।" যথারীতি নৃপেনদে'র নাম ঘোষণা হলো। নৃপেন দে stage-এ প্রবেশ করবেন সেই মুহূর্তে Wings -এর পাশ থেকে তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তা Dr. G.N. Chattarjee আবার মনে করিয়ে দিলেন—"ওস্তাদ্‌জী short করে।"

নৃপেন দে শান্তভাবে গিয়ে মঞ্চে বস্‌লেন ভাল করে আর একবার এস্‌রাজ ও তবলার সুর ঠিক্ আছে কি না দেখে নিলেন। সবাইকে অবাক করে দিয়ে দু'বার Bowing করলেন। ১ম Bowing সা, রে, গা, মা, পা,ধা, নি,সা। ২য় Bowing- সা,নি,ধা,পা,মা,গা,রে,সা। বল্‌লেন "এর থেকে short বাজ্‌না আমার জানা নেই-নমস্কার।" বলে মঞ্চ থেকে নেমে গেলেন।

আদর্শ শিক্ষক ঃ

৺লহরী দেববর্মন 'বিশারদ' কোর্সের সেতার-সরোদের ক্লাশ নিতেন। ক্লাশ হতো বিকালে ৪-৩০মিঃ থেকে রাত ৮-৩০মিঃ পর্যন্ত। অন্যান্য অধ্যাপক অধ্যাপিকা বৃন্দ ৪-৩০মিঃ এ ক্লাশে গেল কিনা আমাকে যখন দেখ্‌তে হতো তখন লহরী দেববর্মন বিকাল ৩টায় কলেজে এসে পড়্‌তেন। ধীরে ধীরে ক্লাশের সব বাদ্য যন্ত্রগুলিকে (সেতার-সারোদ) মিলিয়ে নিতেন এবং ছাত্র/ছাত্রীরা কে কোথায় বসবে সেভাবে বাদ্য যন্ত্রগুলি সাজিয়ে রেখে দিতেন যাতে বিকাল ৪-৩০মিঃ এর সঙ্গে সঙ্গে ক্লাশ শুরু করা যায়। ৪-৩০মিঃ এ ক্লাশে গিয়ে ১৪/১৫ টি সেতার-সরোদের মত বাদ্য-যন্ত্র মিলিয়ে শেখাতে গেলে ক্লাশের অনেকটা সময় চলে যাবে—তাই উনার নিজস্ব এই ব্যবস্থা।

একবার "এস্‌রাজ" ক্লাশের অধ্যাপক ৺নৃপেন দে ১৭/১৮ বছর বয়সের এক ছাত্রীকে ক্লাশের Lesson তৈরী করতে না পারার শাস্তি স্বরূপ এস্‌রাজের ছড়ি দিয়ে বেশ কয়েক 'ঘা' দেওয়ার পর তার গত কয়েক বছরের সঙ্গীতের Note Bookটি কুটি কুটি করে ছিড়ে ফেলে ক্লাশ থেকে বেড়িয়ে আসেন। "আমি আসতে পারি" বলে আমার Room-এ ঢুক্‌লেন। আমি তখন Head Clerkকে নিয়ে কাজ করছিলাম। আড় চোখে দেখ্‌লাম উনি ভীষণ উত্তেজিত। ইচ্ছা করেই আমি ২/৩মিনিট কথা বলিনি উনি দাঁড়িয়ে ছিলেন আমার টেবিলের সামনে। কারণ নৃপেন দে আমার Room-এ ঢোকার আগেই আমি ঘটনা জেনে গিয়েছিলাম। ২/৩মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে উনি রাগত স্বরে বলে ওঠ্‌লেন—"আমি যে এতক্ষণ দাঁড়াইয়া রইছি আপ্‌নে কি আমারে দেখ্‌তাছেন না?" আমি মুখ তুলে তাকিয়ে শান্তভাবে বল্‌লাম "আরে! ওস্তাদজী? বসেন।" বলে আমি ৮/১০ মিনিটে Head Clerk -এর সঙ্গে File এর কাজটা সেরে নিলাম। তারপর নৃপেন দে'র দিকে তাকিয়ে বল্‌লাম—"ওস্তাদজী কন্ কন্ কেন্ আইছেন।" তখন নৃপেন দে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন—"আপ্‌নে তো সাংঘাতিক লোক"। আমি অবাক হয়ে বল্‌লাম —"কেন আমি কি করলাম?" উনি বল্‌লেন---"আমি আপ্‌নের কাছে একটা নালিশ লইয়া আইছিলাম্। অনেকক্ষণ আমার রাগটা আছিল—এতক্ষণ বইয়া থাইক্যা আমার রাগটা গেছে গা। অহন্ কন্ কি হইছে ওস্তাদজী বলেন!" তারপর তিনি ক্লাশের ঘটনা বল্‌লেন।

সব শুনে আমি বল্‌লাম—স্কুল-কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের গায়ে হাত তোলা বে-আইনী। লোকে জানলে কলেজের বদ্‌নাম হবে। শিক্ষা বিভাগ কৈফিয়ৎ চাইবে। তাছাড়া আপনি মেয়েটির খাতা-পত্র ছিড়ে ফেলেছেন সাম্‌নে পরীক্ষা সে কীভাবে পরীক্ষা দেবে? আপনি তাকে ছোট বয়স থেকে শেখাচ্ছেন। পরীক্ষায় ফেল করলে বা খারাপ result হলে লোকে আপনারই বদ্‌নাম করবে। বল্‌বে—"এত বছরে কি শেখালো—নৃপেন দে?" কাজটি আপনি ঠিক্ করেন নি—কি বলেন?

এইসব কথাবার্তার পর গম্ভীর মুখে উনি আমার room থেকে বেড়িয়ে গেলেন। ২/৩দিন পর নৃপেন দে এসে আমাকে জানিয়ে গেলেন নিজের পয়সায় Exercise Book কিনে সারা বছরের Lesson সব Copy করে দিয়েছেন ঐ ছাত্রীকে।

১৯৭৮ সনে ভাতখন্ডে সঙ্গীত বিদ্যাপীঠের তৎকালীন অধ্যক্ষ জি.এন্. নাটু আগরতলা সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে 'বিশারদ' পরীক্ষা নিতে এসেছিলেন। ইনি পঃ বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখন্ডজীর শিষ্য, বিশিষ্ট শাস্ত্রীয় কণ্ঠ-সঙ্গীত শিল্পী, সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ এবং পন্ডিত ব্যক্তি। আমি যখন ভাতখন্ডে সঙ্গীত বিদ্যাপীঠে বাদ্য বিশারদ এর ছাত্র সে সময় নাটু সাহেব কণ্ঠ সঙ্গীতের বিশারদ (4th year, 5th year) ক্লাশ নিতেন। উনার নির্দেশ অনুযায়ী আমিও নাটু সাহেবে ক্লাশ (কণ্ঠ সঙ্গীত) attened করতাম। সে দিক থেকে নাটু সাহেবও আমার একজন সঙ্গীত শিক্ষা গুরু। নাটু সাহেব সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের নিকট একজন 'কড়া' শিক্ষক হিসাবে-ই পরিচিত ছিলেন। রাগ-রাগিণীর শুদ্ধতা, তার 'খুটি-নাটি' বিষয় লক্ষ্য রেখেই শেখাতেন। তার লেখা বেশ কিছু গান ভাতখন্ডজী রচিত "ক্রমিক পুস্তক মালিকায়" স্থান পেয়েছে—

নাটু সাহেব আমাদের College -এ পরীক্ষা নিতেন সকাল বিকাল দু-বেলাই। যখন যে ক্লাশের পরীক্ষা শুরু হতো প্রথমেই সেই ক্লাশের Teacher কে ডেকে নিতেন। কি কি শেখানো হয়েছে জেনে নিতেন। কোর্স Complete না হয়ে থাকলে তিরস্কারও করতেন। তারপর পরীক্ষার্থীরা যখন একজন একজন করে উনার সামনে উপস্থিত হতো প্রথমেই জিজ্ঞাসা করতেন syllabus শেষ হয়েছে কি-না। না হয়ে থাকলে পত্রপাঠ next year এর জন্য বিদায়। প্রতিদিন রাত ৮টা-৮.৩০মিঃ এরপর পরীক্ষা শেষে আমার সঙ্গে আলোচনার সময় ভীষণ বিরক্তি প্রকাশ করলে কখনো কখনো আমাকে তিরস্কারও করেছেন। আমার শিক্ষাগুরু হিসাবে আমাকে তিরস্কার করার অধিকার উনার অবশ্যই ছিল।

সপ্তাহব্যপী Practical পরীক্ষা শেষে আমাদের Teacher's Common Room-এ সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। বিস্তারিত আলোচনায় উল্লেখ করেছিলেন কিভাবে আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়ে ভাতখন্ডে সঙ্গীত বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা হয়—"ভাল ঘর নেই বাদ্যযন্ত্র কেনার পয়সা নেই—ছাত্র/ছাত্রীদের বসার জন্য সতরঞ্চি নেই—শিক্ষক/শিক্ষিকাদের প্রয়োজনীয় পারিশ্রমিক দেওয়ার অর্থ নেই—ছিল আমাদের উৎসাহ, কর্তব্যবোধ এবং মনের দৃঢ়তা"। তার পরই বল্লেন—"তোমাদের সরকার Music College-এর জন্য পাকা বাড়ী করে দিয়েছে মাথার উপরে 'Fan' মেঝেতে সুদৃশ্য কার্পেট দামী দামী সব Musical Instruments মাসের শেষে মোটা পারিশ্রমিক নিশ্চিত—আমরা কল্পনাও করতে পারিনি সেদিন—আজও পরি না। কিন্তু পরীক্ষা নিতে গিয়ে পরীক্ষার্থীদের Performance দেখে আমি হতাশ। যদিও আমার মনে হয়েছে ছাত্র/ছাত্রীদের যথেষ্ট Talent রয়েছে। তবু কেন এই অবস্থা? তার দু'টো কারণ হতে পারে—১) তোমরা---শিক্ষক/শিক্ষিকারা ছাত্র/ছাত্রীদের ঠিকমত শিক্ষা দিচ্ছনা—২) হয়তো তোমরা নিজেরাই অনেক কিছু জাননা— শিক্ষক হওয়ার মত যোগ্যতার অভাব।" লক্ষ্ণৌ ফিরে গিয়ে এ বিষয়ে Natu সাহেব একটা বিস্তারিত report'ও পাঠিয়েছিলেন।

সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় পুরানো বাড়ীতে থাকার সময় আমরা যে সব সুযোগ সুবিধা বা অসুবিধা ভোগ করেছি—যে প্রকার পরিকাঠামো ছিল তার তুলনায় নতুন রূপে—নতুন নামকরনে' শচীন দেববর্মন স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে'র পরিকাঠামো অনেক বেশী উন্নত, অনেক বেশী সুন্দর এবং প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট। বর্তমান সরকার সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের উন্নয়নে যথেষ্ট যত্নবান। সঙ্গীত ও সংস্কৃতিপ্রেমী আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার মহোদয় এবং শিক্ষা মন্ত্রী তপন চক্রবর্তী মহোদয় এ বিষয়ে খুবই আন্তরিক বলে আমি মনে করি। প্রসঙ্গতঃ মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার মহোদয়ের মাতৃদেবী পুলিন দেববর্মন মহাশয়ের নিকট শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন এবং শ্রী সরকার নিজেও ছাত্র জীবনে অশ্বিনী কুমার বিশ্বাসের নিকট 'তবলা' বাদন শিক্ষায় তামিল নিয়েছিলেন। আমাদের শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী মহোদয় একমাত্র পুত্র তুহিন চক্রবর্তী সঙ্গীতে পারদর্শী রূপে আলোকিত হওয়ার পূর্ব্বেই সে সুরলোকে গমন করেছে। মন্ত্রীসভার বর্তমান ও প্রাক্তন অনেক সদস্যদেরই সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ সর্বজন বিদিত।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো উন্নয়নের দায়িত্ব সরকারের উপর, কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের, অর্থাৎ শিক্ষার মান, শৃঙ্খলা, ইত্যাদির সিংহভাগ দায়িত্ব কিন্তু শিক্ষক/শিক্ষিকা বা অধ্যাপক/অধ্যাপিকা এবং অধ্যক্ষ/অধ্যক্ষার উপরই বর্তায়। তাই সংশ্লিষ্ট সবার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ রইল সবাই সমবেতভাবে যত্নবান হন যাতে ভবিষ্যতে "শচীন দেববর্মন স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের কোন অধ্যক্ষ বা অধ্যক্ষাকে আমার মত কোন বহিরাগত গুণী জনের অস্বস্তিকর কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে না হয়---বরং এই মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গৌরবে যেন গৌরবান্বিত হতে পারেন। কোন তত্ত্বকথা নয়। আমার কিছু কথা কিছু স্মৃতির মঞ্জরী পাঠকদের কাছে তুলে ধরলাম।

পরিশেষে জেনে খুবই আনন্দিত হয়েছি—এই বছর সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় (নতুন নামকরণ শচীন দেববর্মন স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়) সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছে। এই উপলক্ষে মহাবিদ্যালয়ের ম্যাগাজিন "মূর্চ্ছনা'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে। মহাবিদ্যালয়ের মাননীয়া অধ্যক্ষা শ্রীমতী মণিকা দাস মহোদয়া "মূর্চ্ছনা"য় লেখা দেবার জন্য আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন—সে জন্য শ্রীমতী দাসকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

স্মৃতি-বিস্মৃতির আলোকে সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়

■ ড. উমাশঙ্কর চক্রবর্তী

আমি আজ আমার নৃত্য জীবনের শুরুর কথা বলছি।

সেই সময়টা আগরতলায় 'নেই'-এর যুগ। যা কিছু অন্য শহরে সুযোগ ছিল সেটা এখানে ছিল না। এরজন্য আগরতলাবাসীদের কোন আক্ষেপও ছিল না।

আমি যে সময়টার কথা বলছি সেটা ৬০-এর দশকের সময়কার ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকীতে সারা ভারতবর্ষে রবীন্দ্র প্রণামের যে ঢেউ এসেছিল তার কিছুটা ঢেউ আগরতলায়ও লেগেছিল। সেইসময় আমি খুবই ছোট। ক্লাস টুতে পড়ি। কিন্তু আমার এখনো ছবির মতো মনে আছে বড়দোয়ালী স্কুলে ''চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের কথা। সেখানেই আমি প্রথমে সমীর দাসকে দেখি। দেখি আরেক জনকেও। তিনি হলেন ড. পদ্মিনী চক্রবর্তী। আমি সেই চন্ডালিকার রিহার্সাল ও অনুষ্ঠানটিও দেখি। সেটা আমার সুখকর স্মৃতির মধ্যে একটি। এখান থেকেই আমার নৃত্যের প্রতি আকর্ষণ শুরু হয়। এই সময়েই নাটক, নৃত্য, গানের জোয়ার এসে যায় আগরতলায়।

আমি ক্লাস থ্রি থেকে সংগীত ভারতী (শিববাড়ীতে ছিল) নাচ শেখা শুরু করি। আমাকে ভর্ত্তি করিয়ে নেন ৺রবি নাগ মহাশয়। সদ্য রাজস্থান থেকে আসা বিহারী মাষ্টারমশায় আমাদের নাচ শেখাতেন। তখন সেখানে শিলা সেনগুপ্তা, শিবানী চক্রবর্তী, গৌরী দাসগুপ্তা, শিবানী চৌধুরী তাদেরও নাচতে দেখি। শিবানীদি ও শিলাদি তখন খুবই ভাল নাচতেন। শিবানীদি তো রীতিমত-ক্লাসিকেল কনফারেন্স গুলিতেও নাচতেন। তখন থেকেই মণিপুরী নাচের ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা কমতে শুরু করে। কত্থক নাচের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। এই নাচের সঙ্গে ত্রিপুরার মানুষের ধীরে ধীরে পরিচয় ঘটে।

৺বিহারী সিং এ রাজ্যে কত্থক নাচের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এরমধ্যে অনেক জল গড়িয়ে গেল আত্মীয় স্বজনের চাপে আমার নাচ শেখা বন্ধ হয়ে গেল। তবে মাঝখানে রবীন্দ্রপরিষদের উদ্যোগে এম.বি.বি. কলেজে 'কালমৃগয়া' নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হল। সংগীতে ছিলেন ৺সমীর কান্তি দাস, ৺অমিয় মুকুল দে, সত্যব্রত ভট্টাচার্য, কমল চক্রবর্তী, ৺স্বপন দত্ত, লিখন চৌধুরী প্রমুখ। নৃত্যে হীরা দে, উমাশঙ্কর চক্রবর্তী, গৌরী দাসগুপ্তা, মাখন দে, যূথিকা, স্নিগ্ধা মজুমদার প্রমুখ। একমাস রিহার্শাল করে এম,বি,বি কলেজের রবীন্দ্র হলে অনুষ্ঠিত হল 'কালমৃগয়া'। আমি যেহেতু সবচেয়ে ছোট ছিলাম তাই আমার ড্রেসও মেকআপ সবটাই করেছিলেন গায়ত্রী পুরকায়স্থ। প্রফেসর মোহিত পুরকায়স্থের স্ত্রী, উনার কালো প্রিন্টেড শাড়ীটাও আমার স্মৃতিতে আজও রয়েছে।

এর কিছুদিন পর পরেই অনন্ত মাষ্টার মশায় আমাদের বাড়ীতে এলেন এবং বাবা-মাকে বুঝিয়ে আমাকে আবার নাচে ভর্ত্তি করে দিলেন। এবার মিউজিক কলেজে। ততদিনে সরকারী মিউজিক কলেজ তৈরী হয়েছে, প্রিন্সিপাল পি.এন ভার্বে, ভাইস প্রিন্সিপাল শ্রী পুলিন দেববর্মা। কণ্ঠ সঙ্গীতে গৌরী চক্রবর্তী, শুভ্রা দাস, ঝর্ণা দেববর্মণ, কনিকা চক্রবর্তী, ব্রজগোপাল সিংহ (শান্তিনিকেতন) শিবেন্দ্র চক্রবর্তী, মালতী ভার্বে, সত্যেন্দ্র দাস, সাধন ভট্টাচার্য, নারায়ণ দেববর্মা, রমেন্দ্রনাথ দে, হীরন দেববর্মা, আরতি কর প্রমুখ শিক্ষক শিক্ষিকারা ক্লাস করাতেন। এছাড়াও যন্ত্র সংগীতে উৎপল দেববর্মা, অনাথবন্ধু দেববর্মা, লহরী দেববর্মা, নৃপেন সাধু, গণেশ দেববর্মা, তবলায় অশ্বিনী বিশ্বাস, পিনাক পানি গুপ্ত, অনুপম ঘটক, গোপাল বিশ্বাস, মনীন্দ্র লাল রায়, লক্ষীকান্তদা আর কত্থক ও মনিপুরী নাচে বিহারী সিং ও অঙ্গথোম্বি সিং ছিলেন।

শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের তখন যেমন চাঁদের হাট ছিল তেমনি ছাত্র ও ছাত্রীরাও ছিল যথেষ্ট গুণমান সম্পন্ন এবং পরবর্তীকালে তারা নামী শিল্পী হয়েছেন। বাণী চক্রবর্তী, স্বাতী সাহা, ভারতী, রতন সেনগুপ্ত, চন্দন সেনগুপ্ত, শেলী সেনগুপ্ত, জহর ব্যানার্জী, নমিতা ভট্টাচার্য, মিলি সেনশর্মা, কাবেরী মজুমদার, ব্রজলাল, সমীর ব্যানার্জী, মণিমঞ্জরী ভট্টাচার্য, অলকা ভৌমিক, অমিতাভ ভট্টাচার্য, হৈমন্তী দেববর্মন (উন্টি) শিখা চক্রবর্তী, শিখা মুখার্জি, নন্দা মুখার্জি, গৌরী দাসগুপ্তা, শিপ্রা সেনগুপ্তা, লুসি, জবা ঘোষ, মিঠু, অনিন্দিতা দত্ত, দয়িতা, বন্দনা, স্বপ্না সেনগুপ্তা, নমিতা ভৌমিক, আরও অনেকে। তবে এখানে যাদের কথা লিখলাম সবটাই আমার মিউজিক কলেজে নাচ শেখার সময়ের কথা।

এবার আসছি মিউজিক কলেজের অনুষ্ঠান করার কথা। সেই সময়ে রবীন্দ্রনৃত্য ও ক্রিয়েটিভ নৃত্যের জন্য অনন্ত মাষ্টার মশাইয়ের নাম অবশ্যই করতে হয়। একবার বর্ষামঙ্গল হয়েছিল সেখানে অমিতাভ, বাণী চক্রবর্তী, শিপ্রা সেন, সুমী, মিঠু অনেকেই আমরা

নেচেছিলাম। তারপর কোন এক ভি,আই, পি প্রোগ্রামে, আমি, অমিতাভ, কান্তা, জবা, রুনা, শিলা, মিঠু নেচেছিলাম 'নৃত্যের তালের তালে' গানটির সঙ্গে। সে কী রিহার্সাল মিউজিক কলেজ ও বেসিক ট্রেনিং কলেজের হলে। পূরবী চন্দ হয়েছিলেন রাধা। আমরা কোন রোল-এ অংশ গ্রহণ করিনি। কিন্তু অনুষ্ঠানের সঙ্গে সবাই জড়িয়ে ছিলাম আনন্দের সঙ্গে। নানা কাজ করেছিলাম। সেটা ছিল ভানু সিংহের পদাবলী। রাজ্যপাল এসেছিলেন সেই অনুষ্ঠানে। গানে কলেজের দিকপাল শিল্পীরা গাইতেন আর তার সঙ্গে যন্ত্রে থাকতেন লহরী দেববর্মা, উৎপলদা ও অনাথ দা স্বয়ং। নৃত্যে আমরা ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করতাম। তখন সিন্থেসাইজারের যুগ আসেনি। শুধুমাত্র সেতার, সরোদ, বাঁশী ও তবলা সহযোগে। আমাদের কী যে ভাল অনুষ্ঠান হত। কেউ কেউ হয়ত বলবেন পুরানো মানে ভাল আর নূতন মানে খারাপ। এই ধারণা করেই লিখছি। কিন্তু আমি এমন সন্ধিক্ষণে এসেছিলাম যে দুই যুগকেই আমি দেখতে পেয়েছি এবং নিজেও দুই যুগে অংশগ্রহণ করেছি।

তাছাড়া মিউজিক কলেজে বছরে দুইবার শাস্ত্রীয় সংগীতের আসর বসতো। তাতে ৺পুলিন ঠাকুরের গান, উৎপলদার সেতার অনাথদার সরোদ, গোপালদার তবলা ইত্যাদি শুনতে পেতাম। শিক্ষকদের অনুষ্ঠানে পি, এন ভার্বের দুই পাশে স্বাতীও ভারতী উনার সঙ্গে মেলাত। এখনও সেসব মহার্ঘ দৃশ্য ছবির মতো ভাসে। শুভ্রাদি, কণিকাদির গান শোনাও একটা বিরল অভিজ্ঞতা।

এখন আমরা যাকে ক্রিয়েটিভ নাচ বলি তার জন্মও আমি দেখেছি এই মিউজিক কলেজে এর অনুষ্ঠানে। অনন্ত মাষ্টার মশায় একবার মঞ্চকে অনেক যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজিয়েছিলেন। আর নিজে নৃত্যের ভঙ্গিমায় বা ছন্দে একেকটা যন্ত্র বাজানোর অভিনয় করেছিলেন। যেন মনে হচ্ছিল তিনিই একজন গন্ধর্ব। মঞ্চের বাইরে থেকে তাকে এই যন্ত্রের সাহায্যে সুর ও ছন্দ বাজানো হচ্ছিল। না দেখলে বিশ্বাস হবে না। আমরা মুহূর্তের জন্য যেন সবাই হারিয়ে গেছিলাম এই চমৎকার দৃশ্যায়নে।

এই রকম অজস্র স্মৃতি আজও আকুল করে তোলে। তাই মনে হয় এটা আমার জীবনের অর্ধেক আকাশ নয়। আমার এই জীবনের সবটাই এই আকাশ। তখন সবে নাচতে শুরু করেছি, স্কুল ও কলেজে নানা রকম অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি। একটু একটু করে সবাই চিনছে আমায়। আমিও এমন সুযোগ পেয়ে দিশাহারা। ঘরে মন বসেনা, পড়ায়ও মন বসেনা। কখন যাবো ক্লাসে বা রিহার্শালে। আজ আমি কৃতজ্ঞচিত্তে আমার নাচের গুরুদের (বিহারী সিং ও অনন্ত দেববর্মন) স্মরণ করি এবং প্রণাম জানাই। তাঁরা আমাকে এই মিউজিক কলেজে শিক্ষার সময় কত না যত্ন নিয়েছেন। তাদের ভালবাসা ও প্রশ্রয় ছাড়া আমি নাচ শিখতে পারতামনা। এই রকম অজস্র স্মৃতি এখনও সজীব রয়েছে আমার মনে। তার মধ্যে থেকে কিছু মণিমুক্তা তুলে ধরেছি এই লেখায়।

মিউজিক কলেজ ছাড়ার পর ২৫ বছর পূর্ত্তিতে আমার আবার ডাক পড়লো মিউজিক কলেজ অনুষ্ঠানে নাচার জন্য। ডাকলেন তদানীন্তন প্রিন্সিপাল ত্রিপুরেন্দ্র ভৌমিক মহাশয়। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে নাচলাম ও অপার আনন্দ পেলাম। ঘটনাচক্রে তারপর কিছুদিন চাকুরী করলাম মিউজিক কলেজে পরবর্তীকালে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ মিউজিক শুরু হলো। এই কলেজেই ক্লাস শুরু হলো। যথারীতি সেখানে আমি এলাম শিক্ষক হয়ে। কলেজের প্রতি ঋণও বাড়লো। এখন আমার ছাত্র ও ছাত্রীরা এই কলেজের নাচের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা। তাই মনে হয় কিছুটা ঋণ হয়ত বা শোধ হল। এই কলেজ থেকে নিয়েছি বেশী দিয়েছি কম।

আমাদের এই ভারতীয় নৃত্যে ও সংগীতে নবরূপ দেখা যাচ্ছে। নৃত্য ও সংগীতের নূতনরূপ আবিষ্কারের যে শ্রম, মেধা এবং অধীত বিদ্যা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তা এখনকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে নেই এই কথা বলা যায় না। অনেকেই বাইরে থেকে নাচ শিখে আসছেন কিন্ত তারা বড় কোন কাজ করছেন বলে শুনিনি—যার দ্বারা আমাদের ত্রিপুরার নৃত্যাঙ্গন উপকৃত হতে পারে।

আমি একজন প্রবীণ নৃত্যশিল্পী বা নৃত্য কর্মী হিসাবে বলতে পারি ৫ মিনিটের সিডি এর সঙ্গে নেচে উন্নত করা যায় না বা মল্লক্রীড়াকে শাস্ত্রীয় নাচের সঙ্গে মিলিয়ে ফিউশান হয়ত বা করা যায় কিন্তু এতে নৃত্যের মঙ্গল হয়না।

আজকাল প্রযুক্তির যুগে নাচ ফিউশান বা রিয়েলিটি শো তে দেখানো হচ্ছে। এটা কিছু সময়ের জন্য। এটা চিরকালীন কোন ব্যাপার নয়, তবে এটা যদি চেপে বসে তাহলে নৃত্যের এবং সঙ্গীতের ক্ষতি হবে বলে আমি মনে করি। তখন এই মিউজিক কলেজের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অর্থহীন হয়ে পড়বে। আমি আশাবাদী এটা হবে না। শাস্ত্রীয় সংগীত ও নৃত্যকে স্বমহিমায় ও স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মিউজিক কলেজের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। একজন সামান্য নৃত্যকর্মী হিসাবে ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকাগণের প্রতি আমার আবেদন থাকবে—যা চিরকালীন নয়, যাতে অমৃত নেই, তাকে প্রশ্রয় দেবেন না, আমাদের ধ্রুপদী ও চিরকালীন শিল্পসম্ভারকে বাঁচিয়ে রাখা ও তার প্রচার প্রসারের দায়িত্ব আপনাদেরই নিতে হবে। সত্য-শিব ও সুন্দরের উপাসনায়। সময়ের দাবির ধুয়া তুলে কেউ যেন আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির আকাশগঙ্গাকে বিপদগামী না করতে পারে, তা দেখা আমাদের সকলের কর্তব্য।

স্বাধীনতা - ২০১৪

■ অনিল সরকার

হায় শ্রীরাম হায় শ্রী-দাম
নামছে আঁধার রাত।
মনে পড়ছে বাবরি চূড়ায়
উড়ছে হাজার হাত।।

ভাঙছে পাথর দেশ থর থর
হিন্দুরাজের ধ্বজা।
জয় হিটলার জয় শিবম্
আজগুবি এক মজা।।

গুজরাটের আয়রন কিং
লালকেল্লায় ভীম।
সংঘপতির রঙ্গ অতি
রামরাজ্যের ক্রীম।।

গোধরাতে জ্বলছে ট্রেন
অগ্নিদগ্ধ লাশ।
দাঙ্গবাবুর রাঙ্গা চরণ
শিশির ভেজা ঘাস।।

আসছে দিন ভয়ংকর
ফ্যাসিবাদের ধ্বনি।
দামিনীদের উলঙ্গরাত
বাতাসেই স্বর শুনি।।

পুঁজিবাদ রুজিবাদ
লগ্নি পুঁজির হাট।
গোটা দেশটাই খোলা বন্দর
কর্পোরেটের ঘাট।।

সেই ঘাটে ভিড়ছে ডিঙা
সাহেব হাজার লাখ।
লালকেল্লায় বাঘের গর্জন
কেওড়া তলায় শাঁখ।।

শঙ্খ বাজে ঘন্টা বাজে
বন্দীশালায় মা।
কালীঘাটে নরবলি
স্বদেশ কাঁদে না।।

স্বাধীনতা তুমি কার
পতাকা কার হাতে।
রক্তে ভাসে সোনার দেশ
ধর্ষিতা মা রাতে।।

জয় শ্রীরাম জয় শ্রী-দাম
শিবম্ শংকরম্
ন্যানো চড়ো ভারত গড়ো
বন্দে মাতরম্।।

‘তবলা’

■ শ্যামল দেব

‘ত’- থেকে তাল, যা সংগীতের প্রাণ
‘ব’- তার বোল, ভাষা যার চাল,
‘ল’- থেকে লয়, যা বিশ্বব্যাপী রয়
তবলা নামটি এই তিনে মিলে হয়।।
তাল হল সময়, আর লয় তার গতি
বোল তার ছন্দ, নেই তাতে দ্বন্দ্ব।।
বোল আর ছন্দ, সবটাই অংক
হিসাব নিকাশ সব তবলারই অঙ্গ।।
তবলায় যন্ত্র, তবলায় নৃত্য
তবলায় কণ্ঠ, তবলায়ই আনন্দ।।
সংগীতে যাহা ভাবি তাল আসে প্রথমে
বিনা তালে পৌঁছবে অতীতের আদিতে।।
দুঃখ যেখানে রয় তাল তার সাথে নয়
করুণ সুরটি হয় তবলা - বিহনে।।
অংকে মেধাবী যাঁরা, তবলা বাজান তাঁরা
তেরেকেটে ধেরেকেটে উড়ান সপাটে।।

পাওনা

■ নীলাদ্রি দেবনাথ

তোমার সুমিষ্ট স্বরে
সুর সংযোজিত হলেই
আমার আঙুলগুলো ছন্দে নেচে ওঠে,
তবলাতে অন্য মাত্রা খুঁজে পায়,
সংগীতের প্রতি অনুরাগ বেড়ে গিয়ে
তোমার কণ্ঠ আরও সুরেলা হয়ে যায়!
তখন জীবনের সকল ব্যর্থতা ভুলে যাই,
তোমার একমাত্র যোগ্য হয়ে উঠি,
অবক্ষয়ের পৃথিবীতে এর চেয়ে
বড় পাওনা আর কি হতে পারে?
তবে কি আমি তোমায়
সত্যিই ভালবাসতে পেরেছি!!

আমার স্বপনচারিণী সুচিত্রা সেন

■ সংহিতা ঘোষ

'আমি এ-পৃথিবীতে কিছু একটা করতে এসেছি, হারিয়ে যেতে আসিনি। আমি মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকবো।" কথাটা সত্যিই, চিরদিনের মত আমাদের কাছ থেকে অনন্তলোকে চলে গেলেন এই মহানায়িকা সুচিত্রা সেন। কিন্তু অভিনয়ের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি বাঙালী জীবনের এক অন্যতম অধ্যায়। যাঁর কথা আমরা চিরকাল স্মরণে রাখবো। সুচিত্রা সেন সবদিক দিয়ে বাঙালিয়ানায় ভরা। তিনি স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের প্রতীক হয়ে থাকবেন আমাদের হৃদয়ে।

১৭ই জানুয়ারী টিভির পর্দা খুলেই যখন দেখলাম যে সুচিত্রা সেন আর আমাদের মধ্যে নেই তখন মনটা যে কি ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। হাসপাতালে পঁচিশ দিনের লড়াইয়ের পর বাঙালীর স্বপনচারিণী ম্যাডাম সুচিত্রা চিরবিদায় নিলেন। যদিও অনেক বছর আগেই কোন এক অজ্ঞাত কারণে তিনি স্বইচ্ছায় নির্বাসনে চলে যান। তিনি লোকালয়ে আসতে চাইতেন না। কালীঘাটে যখন পুজো দিতে যেতেন তখন মন্দিরে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হোতো না। তিনি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর এই ব্যাপারটা আমার ভীষণ ভাল লাগতো। আমি নায়িকার এই সুন্দর রূপটাকেই মনে রেখেছি। কারণ তার বৃদ্ধ বয়সের রূপটা আমি দেখিনি। তাই এই গ্ল্যামার গার্ল এর রূপসী মূর্তিটিই চিরকাল আমার কাছে নজরবন্দী হয়ে থাকবে।

আমি অনেক ছোট্ট বয়সে মহানায়িকার অভিনীত 'অগ্নিপরীক্ষা' সিনেমাটি দেখি। সঙ্গে ছিল আমার মা ও দিদি। সিনেমা কি ভাল করে জানতামও না। যেতে হয় তাই গেছি কিন্তু 'অগ্নিপরীক্ষা'-য় সুচিত্রা সেনের কিছু কিছু অভিনয় এখনও আমার মনে দাগ কেটে রয়েছে। সেই ছবিগুলি বার বার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে। এত সুন্দর অভিনয় যা বলাার অপেক্ষা রাখে না। এই ছবির একটা গান আমার খুব মনে পরে "কে তুমি আমারে ডাক অলখে লুকায়ে থাকো। ফিরে ফিরে চায় দেখিতে না পায়"।

১৯৩১ এর ৬ই এপ্রিল পাটনায় মামার বাড়িতে জন্ম হল সুচিত্রা সেনের। ভারী মিস্টি চেহারা গায়ের রঙ আটপৌরে, তাই নাম রাখা হল কৃষ্ণা। বাবা করুণাময় দাসগুপ্ত ও মা ইন্দিরা দাসগুপ্ত। ভাইবোন মিলে তারা ন'জন। কৃষ্ণা একটু বড় হবার পর তার নাম বদলে রাখা হল রমা। দিনের অনেকটা সময় সে তার তিন পিসির সঙ্গে কাটাতো। পিসিরা বয়সে বড় হলেও তাদের সঙ্গে ছিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক। কৃষ্ণার সমস্ত দুষ্টামি ও অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতেন তার বড়দা নিতাই। এইভাবে হেসে খেলে বাংলাদেশের পাবনায় কেটেছিল কৃষ্ণার ছোটবেলা। পাবনা গার্লস হাইস্কুলে তাঁর অনেক বান্ধবীও হয়ে গেল। পরবর্তী সময়ে তাঁর এক বান্ধবী ডান্সার্স গিল্ডের প্রতিষ্ঠাতা হলেন, যাঁর নাম ছিল মঞ্জুশ্রী চাকী। অনেক সময় রমা একা থাকতে ভালো বাসতেন। মাঝে মাঝে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের মনে হত তিনি তাদের কেউ নয়। কাশফুলের বন, জামরুল বাগানের নির্জনতায় থাকতে তিনি ভালবাসতেন। কেন তা তিনি নিজেও জানতেন না। একদিন ক্লাশের মধ্যে ডেস্কের উপর পা তুলে বন্ধুদের বললেন "আমি জীবনে এমন কিছু একটা করে যাব যার জন্য আমি মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকবো।" বন্ধুরা তখন তাঁকে প্রশ্ন করেছিল "কী এমন কীর্তি তুই পৃথিবীতে রেখে যাবি? তবে সিনেমায় অভিনয় করলে হয়তো......"।

রমা একটু মুচকি হেসে বলল "দেখা যাক"।

১৯৪৭ সালে রমার বিয়ে হলো ব্যারিস্টার আদিনাথ সেনের ছেলে দিবানাথ সেনের সঙ্গে। রমা চলে এলেন কলকাতায়। রমার ভয় হতে লাগলো। এত বড়ো বাড়িতে তিনি হারিয়ে যাবেন না তো'? ক্রমশ তিনি দেখলেন এ বাড়িতে সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। সবারই একটা নিজস্ব জগৎ রয়েছে। তাই তিনিও নিজেকে ব্যস্ত রাখার

জন্য উদ্যত হলেন।

সেই বছরেই বালিগঞ্জ প্লেসের দুর্গামন্দির ক্লাবের উৎসবে ‘নটীর পূজায়’ তিনি রানির অভিনয় করেছেন। এই অভিনয়ের খবর টলিগঞ্জের স্টুডিওতে পৌঁছুতেই পরিচালকদের ফোন আসতে লাগল। ১৯৪৯ সালের একদিন দুপুরবেলায় রমা অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের স্টুডিওতে ঢুকলেন স্ক্রিন টেস্টের জন্য। ‘শেষ কোথায়’ ছবিতে ডাক পরল রমার। এটা ছিল তাঁর প্রথম ছবি। প্রথমত একটু নার্ভাস হয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু পরে তিনি অন্যরকম নারী। প্রথম শটেই নির্ভুল অভিনয় করলেন। টাকার অভাবে শেষমেষ ছবিটি বন্ধ হয়ে গেল। তারপর তিনি কাজ করলেন ‘সাত নম্বর কয়েদি’ ছবিতে। ফিল্মে নেমেই তিনি পরপর চারটি ছবিতে কাজ করেছিলেন। এই ছবিগুলি হল “সাত নম্বর কয়েদি”, “সাড়ে চুয়াত্তর”, “কাজরী” ও “ভগবান শ্রীচৈতন্য”। তারপর অবশ্য অনেকগুলি হিট ছবি আমাদের উপহার দিয়েছিলেন।

কিন্তু তার পরেই সেই রমা বদলে হয়ে গেলেন সুচিত্রা সেন অর্থাৎ মিসেস সেন। ষাট বা সত্তরের দশককে চলচিত্রের স্বর্ণযুগ বলা হয়ে থাকে। সেই সময়ে ছিল উত্তম-সুচিত্রার জুটি। এই দুই বিখ্যাত শিল্পীই চলচ্চিত্র ও দর্শকদের মধ্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁদের অভিনীত সিনেমাগুলি ‘শিল্পী’, ‘হারানো সুর’, ‘শাপমোচন’, ‘সপ্তপদী’, ‘সাগরিকা’, ‘গৃহদাহ’, ‘আলো আমার আলো’ ইত্যাদি। তিনি বেশ কয়েকটা হিন্দি সিনেমাও করেছেন। তিনি “দেবদাস” ছবিতে বেস্ট অ্যাকট্রেস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন। রাজনীতিবিদ ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্রেও তিনি অভিনয় করেছেন। সেই ছবিটি ছিল “আঁধি”।

এক সময়ে খ্যাতি ও যশ তাঁর ব্যক্তি জীবনে উত্তাল ঝড় নিয়ে এসেছিল। তার এই উত্থান স্বামী দিবানাথ সেন কিছুতেই সহ্য করতে না পেরে মদ্যপান শুরু করলেন। স্বামী-স্ত্রীতে দূরত্ব ক্রমেই বাড়তে লাগল। ধীরে ধীরে স্বামী মদ্যপান ও অবসাদে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। সুচিত্রা সেনের শেষ ছবি ছিল “প্রণয় পাশা”। এরপর তিনি স্বেচ্ছায় নির্বাসনে চলে যান। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের চরণে সমর্পিত প্রাণ ছিলেন তিনি।

দীর্ঘ ৮৩ বছর পথচলার ইতি ঘটেছে ১৭ই জানুয়ারী ২০১৪ইং সকাল ৮টায়। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে যেন একটি যুগের অবসান ঘটল। আজ তিনি নেই কিন্তু বাঙালীর হৃদয়াসনে চিরকাল অধিষ্ঠিত থাকবেন। তাঁর প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা রবীন্দ্র-ভাষায় জ্ঞাপন করছি—

“তুমি উষার সোনার বিন্দু প্রাণের সিন্ধু কুলে
শরৎ-প্রাতের প্রথম শিশির প্রথম শিউলি ফুলে।।
আকাশ পারের ইন্দ্রধনু ধরার পরে নোওয়া,
নন্দনেরই নন্দিনী গো চন্দ্রলেখায় ছোঁওয়া,
প্রতিপদে চাঁদের স্বপন শুভ্রমেঘে ছোঁওয়া—
স্বর্গলোকের গোপন কথা মর্তে এলে ভুলে।।”

তবলা বাদক প্রশান্ত দেববর্মা স্মরণে

■ মৃনাল রায়

বলা হয়ে থাকে " কথা আগে না সুর আগে" সঙ্গীত শিল্পীদের বচন। "লেখা আগে না কথা আগে" চিত্র শিল্পীদের অনুভব। আবার বলা হয়ে থাকে যে "জীবন এক অভিনয়" নাট্য কর্মীদের কথা। সেই রকম জীবনে এক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বেঁচে ছিলেন প্রয়াত প্রশান্ত দেববর্মা। আর এই প্রশান্তকে আমার পরিজনরা এবং অফিসের সহকর্মীরা অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে জানত। আজ থেকে সতের বছর আগে চাকুরিসূত্রে তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। সেই দিনগুলি আজও স্মরণে। কি রসিক, ফুটফুটে রাজ পরিবারের ছেলে প্রশান্ত, ছোট বেলা থেকে ভাল তবলা বাদক। মাত্র আট বছর বয়সে ষ্টেজে সহযোগী শিল্পী। গান (লোক, ধ্রূপদী) ইত্যাদি ছাড়াও নানা যন্ত্র সেতার, সরোদ, বাঁশীর সঙ্গে সাবলীল তবলা শিল্পী। ত্রিপুরার নানাহ যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী স্বর্গীয় উৎপল দেববর্মন, স্বর্গীয় অনাথ বন্ধু দেববর্মন,স্বর্গীয় রবীন্দ্র দাস, স্বর্গীয় কালিকিংকর দেববর্মন, শ্রী অলক দেববর্মা, শ্রী অশোক দাস, শ্রী কিশোর কুমার সিংহ এবং শ্রীমতি মণিমঞ্জুরী চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে সহযোগী শিল্পী। তাছাড়াও গানে সহযোগিতা করেছেন শ্রীমতি কণিকা দেববর্মা, শ্রীমতি কাবেরী গুপ্ত, শ্রীমতি তাপসী দত্ত, শ্রী রতন সেনগুপ্ত ইত্যাদি গুণী শিল্পীদের সঙ্গে।

১৯৯৭ সালের জানুয়ারী মাস থেকে চাকুরী নানা কাজের জন্য তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিলাম। চাকুরিতে যুক্ত হবার আগেই মাননীয় উচ্চ আদালতে কেইস ফাইল। একদিন রাত্র ৭টার সময় উকিলের বাড়ীতে যেতে হবে পরামর্শ নেবার জন্য। সন্ধ্যায় খুব বৃষ্টি, রাস্তায় খুব জল। আমি বললাম উকিলের বাড়ী আজ যাব না। সে তখন বলল, চাকুরীর জন্য জীবন মরণের লড়াই। আমাদের যেতে হবেই, যত ঝড় বৃষ্টি আসুকনা কেন উকিলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে। তারপর রাত্র আটটায় হাটুজল পার হয়ে প্রয়াত উকিল বি. বি দেব মহাশয়ের বাড়ী পৌঁছলাম। ঐ দিন বুঝতে পারলাম তার মনের জোর এবং শিখলাম নানা বাধা বিপত্তি কি ভাবে কাটিয়ে কাজটা সম্পূর্ণ করতে হয়। ১৯৯৭ সালের ২৭ জুন কর্মস্থলে প্রথম যোগদান।

তারপর থেকে চাকুরী সূত্রে নানা কাজে তার সহযোগিতা পেয়ে আমি ধন্য। চাকুরীর সূত্রে নানা সহকর্মী ছাত্রছাত্রী অসুস্থ কিংবা ঝামেলায় জড়িয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া এবং নানা পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করত। বয়সে সে আমার থেকে খানিকটা বড় হলেও এক সঙ্গে রাজ্যের বাইরে ১৯৯৮ সালে গৌহাটিতে প্রবীণ পরীক্ষার জন্য যাওয়া এবং ২০০৬ সালে সপরিবারে চন্ডিগড়ে ভাস্কর পরীক্ষার জন্য যাওয়া। এই দুই পরীক্ষার সময় তার কাছ থেকে আমি অনেক তবলার বোল বাণী শিখেছি। আমার কোথাও কোন ভুল হলে সে তা সংশোধন করে দিত।

ত্রিপুরার এবং বহিরাজ্যের নানাহ শিল্পীদের সঙ্গে দাপটে সঙ্গে তবলা সহযোগিতা করা, তাছাড়া একক তবলা বাদনেও তার খুব সুনাম ছিল। পুলিন দেববর্মা স্মৃতি ক্লাসিকেল অনুষ্ঠানে নানা জেলায় পারফর্মেন্স এবং বিচারক হিসাবে থাকা। ত্রিপুরার যুব উৎসবে বিচারক হিসেবে নির্বাচিত হওয়া। ওই সব কিছুর মধ্যেও আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেত।

২০০৮ সালে সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক সংসদ গঠন হল। এই সংগঠনের প্রথম সম্পাদক হিসাবে আমি. নিযুক্ত হলাম। এই শিক্ষক সংসদ গঠনের ক্ষেত্রেও তার খুব অবদান ছিল। উচ্চ শিক্ষা দপ্তরে গিয়ে অধিকর্তা, সহ অধিকর্তার সঙ্গে কথা বলা। পরপর দুবছর শিক্ষক সংসদের সম্পাদক হিসাবে আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করেছে। ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ভি এম. চৌমুহনী পুরানো স্থান থেকে লিচুবাগানের নতুন স্থানে কলেজের স্থানান্তর, এই কমিটিতে ছিল প্রশান্ত। সব জিনিস নেওয়া তার হিসাব রাখা ইত্যাদি কাজে তার অবদান ছিল অনস্বীকার্য। ২০০৯ সালের ১৪ই আগষ্ট শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে নতুন বাড়িতে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত প্রশান্তের কলেজে আসা। খুব মান অভিমান ছিল কিন্তু প্রকাশ করত না। তারপর দীর্ঘ তিন মাস চিকিৎসারত ছিল। ১৭ই মে ২০১১ সালে মাত্র ৪০ বছর বয়সে মৃত্যুর কোলে হেলে পড়ল।

আমার মামাতো ভাই-এর বিয়ের আশীর্বাদের দিন দুপুর ১২টায় হঠাৎ ফোন আসে প্রশান্ত আর নেই, আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। কথা বিশ্বাস হচ্ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্ধু সুশান্তকে ফোন করি একটা খবর শুনলাম তা কি ঠিক। তখন ঐ দিক থেকে উত্তর আসল হ্যাঁ কথা সত্যি, কথা বিশ্বাস হচ্ছিল না প্রশান্তের স্ত্রী নবনীতাকে আবার ফোন করলাম তখন কান্নার রোল এবং উত্তর হ্যাঁ মৃনাল দা প্রশান্ত আর নেই, তার দুই মেয়েকে অনাথ করে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। বিবাহ বাড়ী থেকে সোজা কৃষ্ণনগরস্থিত ঠাকুরপল্লী রোডের বাড়ীর উঠানে দেখি প্রশান্তের নিথর দেহ নিয়ে তার মা, বাবা, দুই মেয়ে এবং স্ত্রী, ভাই বোন সবার কান্নার রোল। আমি তার চেহারার দিকে তাকাতে পারলাম না। যেন একটা পৃথিবী ভেঙ্গে পড়ল, যে বন্ধু আমাকে সাহস জোগাত এবং নানা সাহায্য করত সে আর নেই তাকে আর পাব না। তার স্মৃতি কাহিনীগুলি শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে চির স্মরণীয় থাকবে চিরকাল।

পুরনো সেই দিনের কথা
‘নেই নিষ্ঠা নেই অনুশীলন’

এখনকার গান-বাজনায় নেই নিষ্ঠা, নেই অনুশীলন, শুধু আছে যন্ত্রের যন্ত্রণা—

কথাগুলো বলছিলেন একসময়কার স্বনামধন্য শিল্পী তথা বর্তমানের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পী ও শিক্ষক হিরণ দেববর্মন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সুদীপ্তশেখর মিশ্র।

হিরণ দেববর্মনের জন্ম ১৯৩৭-এ। ছেলেবেলা থেকেই সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ ছিল। সঙ্গীত শিখেছেন (বাংলা গান) প্রথমে কৃষ্ণজিৎ দেববর্মন, অমল দেববর্মনের কাছে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত জগতের প্রাণপুরুষ পুলিন দেববর্মনের কাছে। স্কুল শিক্ষা শুরু হয় নেতাজী স্কুলে। সেখানে একটি অনুষ্ঠানে তিনি গাইলেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যর ‘জীবন মরণ’ ওই গানটি গেয়ে তিনি শ্রোতাদের প্রত্যাশা কুড়িয়েছিলেন। তাছাড়া দু’দুবার তিনি গানটি গেয়েছিলেন। পরবর্তীতে উমাকান্ত স্কুলে ভর্তি হন। সেখানেও অনুরূপভাবে সবার কাছ থেকে ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছিলেন।

স্বাভাবিকভাবে শিক্ষক মহাশয়দের কাছেও স্নেহের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। দশম শ্রেণি উর্ত্তীর্ণ হওয়ার পর সঙ্গীতে চাকুরি নেন। প্রথমে কলেজ অব মিউজিক অ্যান্ড ফাইন আর্টস এবং পরবর্তীতে সরকারি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে ।মিউজিক ইনস্ট্রাক্টর পদে চাকুরিতে থাকাকালীন তিনি বহু শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করেছেন। পাশাপাশি সে সময়কার বাংলা গানের অনুষ্ঠানেও সমানভাবে শ্রোতাদের গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৫০-৭৮ এই আটাশ বছর আগরতলার বহু অনুষ্ঠানে শ্যামল মিত্র ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যর গান গেয়েছেন। বিশেষ করে মলয় মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া ‘শ্রীমতী যে কাঁদে’ গানটি তাঁকে বহু অনুষ্ঠানে একাধিকবার গাইতে হয়েছে। শিলচরে অনুষ্ঠিত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতানুষ্ঠানে ভারতবিখ্যাত শিল্পী প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একই মঞ্চে গান গেয়েছেন এবং সেই সঙ্গে তাঁদের সঙ্গে হারমোনিয়াম ও তানপুরায় সহযোগিতাও করেছেন। এটা তাঁর জীবনে অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা। ১৯৯৫ সালে সরকারি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণের পর সঙ্গীত শিক্ষাদান কার্যে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছেন। বর্তমানের গান-বাজনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলছিলেন, আগেকার গানবাজনার সঙ্গে এখনকার গানবাজনার পার্থক্য অনেক। এখনকার গানে সুরবোধ নেই। রেওয়াজের বালাই নেই। শিল্পীদের আরও ভাল করে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিখতে হবে। ত্রিপুরাতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনেক প্রচার ও প্রসার হয়েছে পুলিন দেববর্মনের জন্যই। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য আজ সবাই আমরা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতচর্চা করতে পারছি।

অনুলেখন
সুদীপ্ত শেখর মিশ্র

Faculty and Other Staff of Sachin Debbarman Memorial Govt. Music College

Department of Vocal & Instrument

1. Dr. Mrinal Chakrabarty (Sr. Lecturer) Deputed
2. Dr. Sigdhatanu Banarjee (Astt. Prof.) Deputed
3. Smt Tripti Wathe (Astt. Prof.) Deputed
4. Sri Sidhartha Choudhury (Astt. Prof.)
5. Sri Sushanta Lodh (Instructor)
6. Smt. Chhanda Nandi (Instructor)
7. Smt Kakali Das (P.G.T)
8. Smt Sunetra Roy (P.G.T)
9. Sri Anuradha Sarma (Guest Lecturer)
10. Sri Abhijit Sarma (Guest Lecturer)
11. Smt Tina Debbarma (Guest Lecturer)
12. Smt Mampi Deb (Guest Lecturer)

Department of TABLA

1. Sri Pradip Kr. Bhattacharjee (Sr. Lecturer)
2. Sri Mrinal Roy (Instructor)
3. Sri Narayan Majumder (Instructor)
4. Sri Shamal Deb (Instructor)
5. Sri Subrata Talukdar (Instructor)
6. Sri Debasish Debnath (Accompanist)
7. Sri Jayanta Rn. Dhar (Accompanist)
8. Sri Pradip Sarkar (Accompanist)
9. Sri Pritam Debbarma (Accompanist)
10. Sri Mrinal Kanti Das (Accompanist)
11. Sri Suman Ghosh (Guest Lecturer)

Department of Rabindra Sangeet

1. Sri Sounak Roy (Astt. Prof.)
2. Smt Sukla Bhattacherjee (P.G.T)
4. Smt Sutapa Choudhury (Accompanist)
5. Smt Mili Saha (Guest Lecturer)
6. Sri Sidhartha Sankar Deb (Guest Lecturer)
7. Smt. Maurita Roy (Guest Lecturer)

Department Dance

Manipari

1. Sri Bankim Sinha (Instructor)
2. Smt Hena Sinha (Guest Lecturer)

Kathak

1. Smt. Manashi Ghosh (Instructor)
2. Sri Chinmay Das (Instructor)
3. Smt. Joshi Debbarma (Accompanist)
4. Smt Purnashree Ghosh (Guest Lecturer)

Bharat Natyam

1. Smt. Smrita Lahkar (Astt Prof)
2. Smt Sanhita Ghosh (Instructor)
3. Smt. Mistu Deb (Guest Lecturer)

Kuchupuri

1. Smt Boby Chakraborty (Guest Lecturer)

Department of Bengali

1. Smt. Manika Das (Astt. Prof.)
2. Smt Kalpana Dey (P.G.T)

Department of English

1. Smt Sarita Banik (Guest Lecturer

Office Staff

1. Sri Parimal Das -Head Clerk
2. Smt. Krishna Choudhury - U.D.D
3. Sri Jaydeep Podder- U.D.D
4. Smt Minakshi Debbarma- U.D.D
5. Sri Rathin Acharjee- U.D.D
6. Sri Thator Roy (Group-D)
7. Sri Bimal Deb (Group-D)
8. Sri Safal Saha (Group-D)
9. Sri Bikash Bhattacharjee(Group-D)
10. Sri Rajib Deb (Group-D)
11. Smt. Pranati Sarker (Group-D)
12. Sri Nandadulal Datta (Group-D)
13. Sri Arun Chakraborty (Night Guard)
14. Sri Sanjit Deb (Computer Operator Contigent)

Library

1. Kalpana Dey (Library Assistant)
2. Sandhya Debbarma (Sorter)

চাই জন কল্যাণ, জন সান্নিধ্য, জন পরামর্শ

নবনির্মিত আন্তঃরাজ্য বাস টার্মিনাস উন্নয়নের নূতন দিগন্ত

১. পুর পরিষদ এলাকায় ত্রিপুরা রাজ্য সরকারী আবাসন প্রকল্পে ৫০টি বাড়িতে পাকা গৃহ নির্মাণের অনুদান প্রদান হয়েছে।
২. সেন্ট্রাল রোডে শিশু বিজ্ঞান উদ্যান সংস্কার ও আধুনিকীরণের কাজ চলছে।
৩. বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পে ৭৭০টি পরিবারকে পাকা গৃহ নির্মাণ সহ এলাকার সার্বিক উন্নয়নের সরকারী অনুদানের সাপেক্ষে কাজ অতিসত্তর শুরু করার প্রক্রিয়া চলছে।
৪. টুয়েপ প্রকল্পে শ্রমদিবস তৈরী করে পুর এলাকার দুস্থ পরিবারের কর্মসংস্থান হচ্ছে।

- আপনার কর সঠিক সময়ে জমা করুণ,

নাগরায়ণের অংশীদার হোন -

সৌজন্যে : পুর পরিষদ, ধর্মনগর

BAMUTIA R D BLOCK

PASSION FOR DEVELOPMENT

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীন রোজগার নিশ্চয়তা আইন
গ্রামের গরীব মানুষের কাছে এক আশীর্বাদ —— যা দেয়
কমপক্ষে ১০০ দিন রোজগারের নিশ্চয়তা

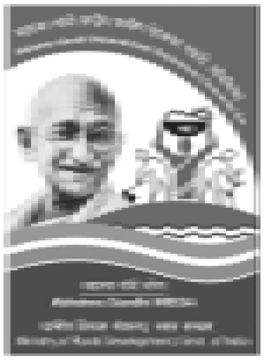

উন্নয়নের জোয়ার বজায় রাখতে ও গ্রামের মানুষের কাজের
অধিকার সুনিশ্চিত করতে ও গ্রামের মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে সকলে এগিয়ে আসুন

আসুন

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীন রোজগার নিশ্চয়তা আইন
(MGNREGA)
এই মহান জাতীয় প্রকল্পকে সার্থক করে তুলি

বামুটিয়া ব্লকের কিছু সাফল্যের কথা

কাজ পাওয়া গেছে	: [illegible]/-	মোট শ্রম দিবস তৈরী হয়েছে	: [illegible] দিন ([illegible] দিন)
মোট রাস্তা হয়েছে	: [illegible] টি	ক্ষুদ্র সেচ	: [illegible] টি
বন্যা নিয়ন্ত্রণ	: [illegible] টি	ইটের রাস্তা তৈরী হয়েছে	: [illegible] টি
ভূমি সমতল	: [illegible] টি	জল সংরক্ষণ	: [illegible] টি

উন্নয়নের পথে

মোহনপুর আর.ডি.ব্লক

(MGNREGA) মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ রোজগার নিশ্চয়তা আইন

উক্ত আইনের অন্তর্গত স্কীম ২রা ফেব্রুয়ারী ২০০৬ ইং থেকে জোর কদমে এগিয়ে চলেছে।

এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে

১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি ও জীবিকার নিরাপত্তা

স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের জীবিকার উন্নতি সাধন।

খরা, বনধ্বংস ও ভূমিক্ষয় রোধ।

উক্ত স্কীমে কাজের জন্য মোহনপুর আর.ডি. ব্লকে এখন পর্যন্ত

১৩১৫৮ পরিবারের রেজিষ্ট্রিকরন হয়েছে।

১২৭১৩ পরিবার কে জব কার্ড দেওয়া হয়েছে।

১২৭১৩ পরিবারের নামে কাজের জন্য ব্যাংক অফিসে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে।

প্রকল্পের স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য ১০০ শতাংশ শ্রমিকদের মুজরী ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে এবং মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত ১৮ টি পঞ্চায়েতে e-M.R. চালু করা হয়েছে এবং ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে e-M.R. চালু করা হয়েছে দৈনিক কাজের মজুরী, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, মাথাপিছু ১৫৫ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। দৈনিক কাজের সময় ৮ ঘন্টা। এ বিষয়ে কোন কিছু জানার থাকলে গ্রাম পঞ্চায়েত বা ব্লক আফিসে অথবা জিলা অফিসে লিখে জানান।

মোহনপুর আর.ডি. ব্লকে ২০১৩-১৪ অর্থ বর্ষে

মোট শ্রমদিবসের সৃষ্টি হয়েছে ঃ ১০,৭৭,৮৪৮

পরিবার পিছু গড়ে কাজ দেওয়া হয়েছে ঃ ৮৫ শ্রবদিবসে

এই আইনের সঠিক রূপায়নে আপনারও দায়িত্ব রয়েছে।

তাই আসুন, সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করুন।

“মানুষের আর্থসামাজিক পরিকাঠামোর মান উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ”

।।মোহনপুর আর.ডি. ব্লক।।